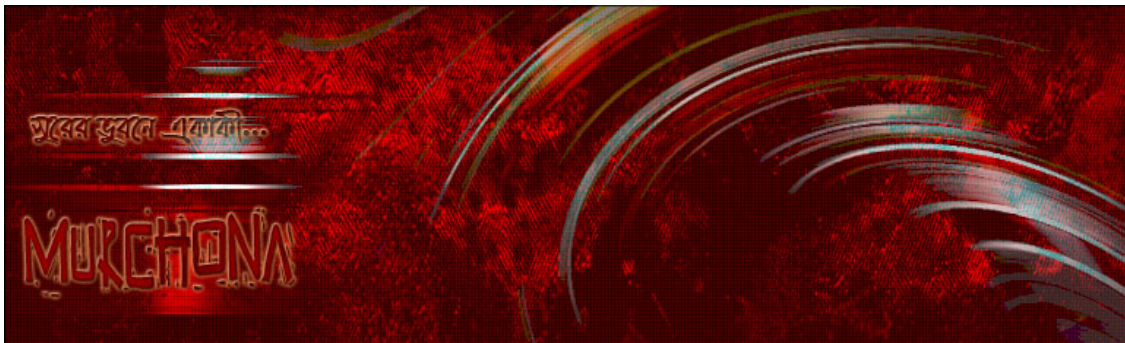


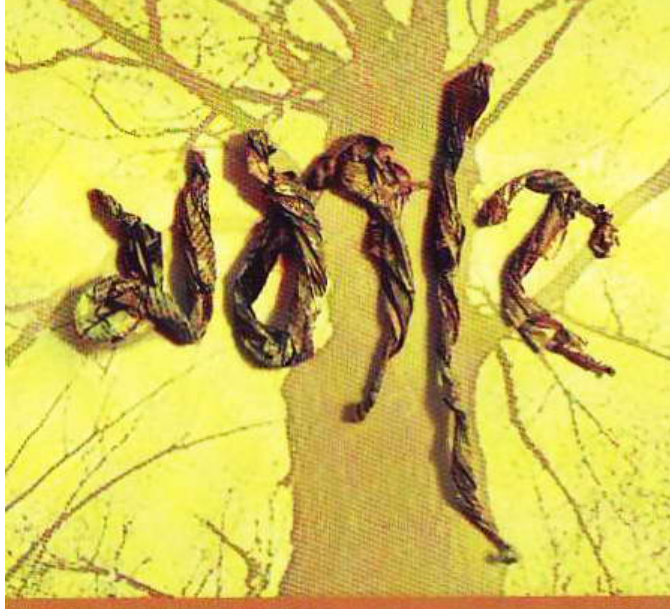
Maddhanya by Humayun Ahmed Part-1



For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

হুমায়ূন আহমেদ মধ্যাহ্ন





আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়

নিষ্ঠুর বন্ধুরে
বলেছিলে আমার হবে
মন দিয়াছি এই ভেবে
সাক্ষী কেউ ছিলো না সেই সময়
সাক্ষী শুধু চন্দ্রতারা
একদিন তুমি পড়বে ধরা
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়

পাষণ বন্ধুরে
দুঃখ দিয়া হিয়ার ভিতর
একদিনও না লইলে খবর
এই কি তোমার প্রেমের পরিচয় ?
মিছামিছি আশা দিয়া
কেনইবা প্রেম শিখাইয়া
দূরে থাকা উচিত কি আর হয়

নিষ্ঠুর বন্ধুরে
বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া
তোমার প্রেম বিকি দিয়া
করবো না প্রেম আর যদি কেউ কয়
উকিলের হয়েছে জানা
কেবলই চোরের কারখানা
চোরে চোরে বেওয়াই আলা হয় ।

—উকিল মুনসি

মেহের আফরোজ শাওন

পরম করুণাময় ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ উপহার তাকে দিয়েছেন।

তার কোলভর্তি নিষাদ নামের কোমল জোছনা।

আমার মতো অভাজন তাকে কী দিতে পারে?

আমি দিলাম মধ্যাহ্ন। তার কোলে জোছনা, মাথার উপর
মধ্যাহ্ন। ঝরাপ কী?

ভূমিকা

আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা তার নিজের লেখালেখির একটা নাম দিয়েছে— ‘আবজাব’। সে যা-ই লেখে তা-ই নাকি আবজাব! আমি আমার লেখার আলাদা কোনো নাম দিতে পারলে খুশি হতাম। ‘যেমন খুশি সাজো’র মতো ‘যেমন খুশি লেখা’। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সে-রকমই। আমি লিখি নিজের খুশিতে। আমার লেখায় সমাজ, রাজনীতি, কাল, মহান বোধ (!) এইসব অতি প্রয়োজনীয় (?) বিষয়গুলি এসেছে কি আসে নি তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। ইদানীং মনে হয়— আমার কোনো সমস্যা হয়েছে। হয়তোবা ব্রেনের কোথাও শর্ট সার্কিট হয়েছে। যে-কোনো লেখায় হাত দিলেই মনে হয়— চেষ্টা করে দেখি সময়টাকে ধরা যায় কি-না। মধ্যাহ্নেও একই ব্যাপার হয়েছে। ১৯০৫ সনে কাহিনী শুরু করে এগুতে চেষ্টা করেছি। পাঠকরা চমকে উঠবেন না। আমি ইতিহাসের বই লিখছি না। গল্পকার হিসেবে গল্পই বলছি। তারপরেও ...

হুমায়ূন আহমেদ

নুহাশ পল্লী, গাজীপুর



হরিচরণ সাহা তাঁর পাকাবাড়ির পেছনে পুকুরঘাটে বসে আছেন।

তাঁর বয়স পঞ্চাশ। শরীর শক্ত। গড়পড়তা মানুষের তুলনায় বেশ লম্বা বলেই হাঁটার সময় কিংবা বসে থাকার সময় ঝুঁকে বসেন। তাঁকে তখন ধনুকের মতো দেখায়। তাঁর মাথাভর্তি ধবধবে শাদা চুল। হঠাৎ হঠাৎ তিনি চলে কলপ দেন, তখন তাঁকে যুবাপুরুষের মতো দেখায়। তাঁর পরনে শান্তিপুরী ধুতি। গরমের কারণে ধুতি লুঙ্গির মতো পরেছেন। খালি গা। তাঁর গাভ্রবর্ণ শ্যামলা। আজ কোনো এক বিচিত্র কারণে তাঁকে ফর্সা দেখাচ্ছে।

সকাল দশটার মতো বাজে। এই সময়ে হরিচরণ সোহাগগঞ্জ বাজারে তাঁর পাটের আড়তে বসেন। বাজারে তাঁর তিনটা ঘর আছে। পাটের আড়তের ঘর তুলনামূলকভাবে ছোট। এই ঘরের গদিতে বসতেই তাঁর ভালো লাগে। এখান থেকে নদীর একটা অংশ দেখা যায়। নদীর নাম বড়গাঙ। বর্ষায় এই নদী কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। বড় বড় লঞ্চ নিয়মিত আনাগোনা করে। তারা কারণে অকারণে 'ভৌ' বাজায়। সেই শব্দ শুনতেও তাঁর ভালো লাগে। আজ বাজারে যাচ্ছেন না, কারণ তাঁর মন সামান্য বিক্ষিপ্ত। পুকুরঘাটে কিছুক্ষণ বসে থাকলে মন শান্ত হবে—এই আশায় তিনি বসে আছেন। ঘাট বাঁধানো। তিনি নিজেই গৌরীপুর থেকে কারিগর এনে ঘাট বাঁধিয়েছেন। কারিগরের কাজ তাঁর পছন্দ হয়েছে। ঘাটের ধাপ সে যথেষ্ট পরিমাণে চওড়া করেছে। ভাদ্রমাসের গরমে অতিষ্ঠ হলে তিনি এই ঘাটে এসে শুয়ে থাকেন। ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শ বড় ভালো লাগে। পাথরের গা থেকে এক ধরনের গন্ধ এসে তাঁর নাকে লাগে। পাথরের কোনো গন্ধ থাকে না, কিন্তু এই গন্ধ কীভাবে আসে? বিষয়টা নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে চিন্তাও করেন।

এখন আষাঢ় মাসের শুরু। গতরাতে বিরামহীন বৃষ্টি পড়েছে বলে আজ আবহাওয়া শীতল। আষাঢ় মাসের কড়া রোদ অবশ্যি আছে। সেই রোদ তাঁকে স্পর্শ করছে না। ঘাটের সঙ্গে লাগোয়া বাদাম গাছ তাকে ছায়া দিয়ে আছে। এই গাছের পাতা কাঠগোলাপের পাতার মতো ছায়াদায়িনী।

হরিচরণের মনের বিক্ষিপ্ত ভাব কমল না, বরং বাড়ল। এই সঙ্গে তাঁর সামান্য শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। শ্বাসকষ্টের উপসর্গ কিছুদিন হলো শুরু হয়েছে। মন-মেজাজ ঠিক না থাকলেই শ্বাসকষ্ট হয়। ঘুমের অসুবিধা হলে শ্বাসকষ্ট হয়। কালরাতে তাঁর ঘুমের কোনো অসুবিধা হয় নি। সারারাত টিনের চালে বৃষ্টি পড়েছে। শীত শীত ভাব ছিল। তিনি পাতলা সুজনি দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে সুখনিদ্রায় গেছেন। তবে ঘুমের কোনো এক পর্যায়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটাই তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হবার একমাত্র কারণ।

স্বপ্নে তিনি চার-পাঁচ বছর বয়সি একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুরছেন। শিশুর মাথায় সোনার মুকুট। তার গাত্রবর্ণ ঘন নীল। স্বপ্নে তাঁর কাছে মনে হলো, শিশুটি তাঁরই সন্তান। আবার এও মনে হলো, এই শিশু শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর নিজের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে না— স্বপ্নে এটা মনে হলো না। কোলের শিশুটি একসময় বলল, ব্যথা। তিনি বললেন, কোথায় ব্যথা? সে তার হাত দেখাল। হাতটা কনুইয়ের কাছে কাটা, সেখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তের রঙও নীল। তিনি রক্ত বন্ধ করার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন ঘুম ভাঙল। তাঁর বিশ্বয়ের সীমা রইল না। হরিচরণের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। প্রথম যৌবনে একটা মেয়ে হয়েছিল। তিন বছর বয়সে মেয়েটা দিঘিতে ডুবে মারা যায়। পুরোহিতের কী এক বিধানে মেয়েটাকে দাহ করা হয় নি। মুসলমানদের মতো কবর দেয়া হয়েছে। যেখানে কবর দেয়া হয়েছে সেখানে তিনি একটা শিউলি গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই গাছ আজ এক মহীরুহ। এই অঞ্চলে এত বড় শিউলি গাছ আছে বলে তিনি জানেন না। তাঁর মেয়ের নামও ছিল শিউলি। এই গাছ বৎসরের পর বৎসর হলুদ বোঁটার শাদা ফুল ফুটিয়েই যাচ্ছে।

প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন কোনো সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি আরেকটি বিবাহ করেন। সেই ঘরেও কোনো সন্তান হয় নি। হরিচরণের দুই স্ত্রীই গত হয়েছেন। তাঁর বিশাল পাকাবাড়ি এখন শূন্য। পাকাবাড়িতে তিনি এখন বাসও করেন না। পাকাবাড়ির দক্ষিণে টিনের দোচালা বানিয়েছেন। টিনের ঘর রাতে দ্রুত শীতল হয়, ঘুমাতে আরাম। বর্ষায় টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হয়। সেই শব্দ তাঁর কানে আরাম দেয়।

অম্বিকা ভট্টাচার্যকে আসতে দেখা যাচ্ছে। হরিচরণ স্বপ্ন বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে চান বলে খবর দিয়েছেন। অম্বিকা ভট্টাচার্য এই অঞ্চলের একমাত্র ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র জানেন। পূজাপাঠ করেন। তাঁর বয়স হরিচরণের চেয়ে কম হলেও তিনি বুড়িয়ে গেছেন। শরীর থলথলে হয়েছে। হাঁটেন কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর

দিয়ে। তাঁর বাড়ি হরিচরণের বাড়ি থেকে খুব দূরে না, দশ-বারো মিনিটের পথ। এই পথ পাড়ি দিয়েই তিনি ক্লান্ত। ঘাটের পাশে তাঁর জন্যে রাখা কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে তিনি বললেন, আগে জল খাওয়াও, তারপর কথা।

জলের সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন দিব ?

অবশ্যই। মিষ্টান্ন বিনা জলপান নিষেধ, জানো না ? সামান্য গুড় হলেও মুখে দিতে হয়। তবে ফল নাস্তি। জলপানের পরে ফল খাওয়া যাবে না।

অম্বিকা ভট্টাচার্য মুখ গম্ভীর করে হরিচরণের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনলেন। কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, স্বপ্নটা ভালো না।

হরিচরণ বললেন, ভালো না কেন ?

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, উঁচু বংশের কেউ যদি দেবদেবী কোলে নেয়া দেখে, তাহলে তার জন্যে উত্তম। সৌভাগ্য এবং রাজানুগ্রহ। নিম্নবংশীয় কেউ দেখলে তার জন্যে দুর্ভাগ্য। সে হবে অপমানিত। রাজরোষের শিকার। তার ভাগ্যে অর্থনাশের যোগও আছে।

বলেন কী!

শাস্ত্রমতে ব্যাখ্যা করলাম। তোমার পছন্দ না হলেও কিছু করার নাই। যাহা সত্য তাহা সত্য। তাছাড়া তুমি দেবগাত্রে রক্তপাত দেখেছ, এর অর্থ আরো খারাপ।

কী খারাপ ?

রক্তপাত হয় এমন কোনো রোগ-ব্যাধি তোমার হতে পারে। যেমন ধর, যক্ষ্মা। শান্তি সস্থায়নের ব্যবস্থা কর। বিপদনাশিনী পূজার ব্যবস্থা কর। অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি কী অপরাধ করলাম ?

অম্বিকা বললেন, দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে ঘুরেছ, এটাই অপরাধ। অপরাধ দুই প্রকার। জ্ঞান অপরাধ, অজ্ঞান অপরাধ। তুমি করেছ অজ্ঞান অপরাধ।

ও আচ্ছা।

অম্বিকা ভট্টাচার্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, পূজা কবে করতে চাও আমাকে জানাবে। যত শীঘ্র হয় তত ভালো। আগামী বুধবার ভালো দিন আছে। চাঁদের নবমী।

হরিচরণ বললেন, পূজা বুধবারেই করবেন। খরচপাতি যেরকম বলবেন সেরকম করব।

ভালো। ঐদিন তুমি উপবাস করবে। নিরসু উপবাস। জলপানও করবে না।
সন্ধ্যাবেলা পূজা হবে। পূজার পর উপবাস ভঙ্গ করবে।

হরিচরণ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

বেলা বেড়েছে। সকালে আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। এখন মেঘ করতে শুরু
করছে। দিঘির পানি এতক্ষণ নীল ছিল, এখন কালচে দেখাচ্ছে। বড় কোনো
মাছ ঘাই দিল। হরিচরণ কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ
আছে। হরিচরণের বর্শি বাইবার শখ আছে। অনেকদিন বর্শি নিয়ে বসা হয় না।
আজ কি বসবেন? মুকুন্দ ঘরেই আছে। তাকে বললেই সে নিমিষের মধ্যে চাড়
ফেলার ব্যবস্থা করবে। পিপড়ার ডিম এনে দিবে। পিপড়ার ডিম বড় মাছের
ভালো আধার। হরিচরণের মনে হলো, হুইল বর্শি নিয়ে বসলেই স্বপ্নটা মাথা
থেকে দূর হবে। স্বপ্ন নিয়ে এত অস্থির হবার কিছু নাই। স্বপ্ন অস্থির মস্তিষ্কের
ফসল। অস্থিরমতিরাই স্বপ্ন দেখে। আলস্য অস্থিরতা তৈরি করে। বর্শি বাওয়াও
এক ধরনের আলস্য, তারপরেও দৃষ্টি কাজে ব্যস্ত থাকে। ফাৎনার দিকে তাকিয়ে
থাকাও এক ধরনের কাজ। মুকুন্দকে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে
গেল। চার-পাঁচ বছর বয়সি একটা ছেলে পেয়ারা বাগানে একা হাঁটাহাঁটি
করছে। ছেলেটা তাঁর দিকে পেছন ফিরে আছে বলে তিনি তাঁর মুখ দেখতে
পাচ্ছেন না।

ছেলেটার গাত্রবর্ণ গৌর। খালি গা। পরনে লালরঙের হাফপ্যান্ট। ঘন
সবুজের ভেতর তার লালপ্যান্ট ঝকঝক করছে। তিনি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে
থেকেই উঁচু গলায় মুকুন্দকে ডাকলেন। ছেলেটা চট করে তাঁর দিকে তাকাল।
তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। কী সুন্দর চেহারা! বড় বড় চোখ। চোখভর্তি মায়া।
খাড়া নাক। চোখের ঘন পল্লব এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি হাত
ইশারায় ছেলেটাকে ডাকলেন। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পায়ে পায়ে আসতে
লাগল। তবে পাশে এসে দাঁড়াল না। একটু দূরে জামগাছের নিচে থমকে
দাঁড়াল।

মুকুন্দ তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি মুকুন্দকে বললেন, বর্শি বাইব,
ব্যবস্থা কর।

মুকুন্দ বলল, জে আজ্ঞে।

এই ছেলেটা কে?

সুলেমানের পুলা।

মুসলমান?

জে আজ্ঞে।

সুলেমানটা কে ?

কাঠমিস্ত্রি । আপনার ঘরের দরজা সারাই করল ।

ছেলেটা তো দেখতে রাজপুত্রের মতো!

ছেলে হইছে মায়ের মতো । মায়ের রূপ দেখার মতো । বেশি রূপ হইলে যা হয় । জিনে ধরা । জংলায় মংলায় একলা ঘুরে । গীত গায় । আমরা বাগানে মেলা দিন আসছে ।

আমি তো দেখি নাই ।

জিনে ধরা মেয়ে । চউক্ষের পলকে সহীরা যায় । দেখবেন ক্যামনে ।

ঠিক আছে তুমি যাও । পিপড়ার ডিম আর কী কী লাগে ব্যবস্থা কর । পুকুরে চাড় ফেল । সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, মাছ আধার খাবে না । বৃষ্টি হলেই মাছ আধার খাওয়া বন্ধ করে । কী কারণ কে জানে ।

মুকুন্দ দ্রুত চলে গেল । হরিচরণ আবার তাকালেন ছেলেটার দিকে । মাটি থেকে কী যেন কুড়িয়ে মুখে দিচ্ছে । মনে হচ্ছে কালোজাম । কিন্তু জাম এখনো পাকে নি । গাছের নিচে পাকা জাম পড়ে থাকার কথা না । হরিচরণ এইবার গলা উঁচিয়ে ছেলেটাকে ডাকলেন, খোকা, এদিকে আস ।

ছেলেটা ছোট ছোট পা ফেলে আসছে । দূর থেকে তাকে যতটা সুন্দর মনে হচ্ছিল এখন তার চেয়েও সুন্দর লাগছে । তার কপালের একপাশে কাজলের ফোঁটা । তার মা নজর না লাগার ব্যবস্থা করেছেন । ঠিকই করেছেন । নজর লাগার মতোই ছেলে । বয়স কত হবে ?

কী নাম তোমার ?

ছেলে জবাব দিল না ।

নাম বলবে না ?

সে না-সূচক মাথা নাড়ল ।

কী খাচ্ছ ?

ছেলে হা করে তার মুখ দেখাল । মুখের ভেতর জামের লাল একটা বিচি । তিনি বললেন, সন্দেশ খাবে ?

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল । তিনি ডাকলেন, মুকুন্দ! মুকুন্দ!

মুকুন্দ আশেপাশে নেই । সে পিপড়ার ডিমের সন্ধানে চলে গেছে । পাকা বাড়িতে বৃদ্ধা মায়ালতা থাকেন । হরিচরণের দূরসম্পর্কের বিধবা জেঠি । তিনি কানে শোনেন না । গুনলেও ঘর থেকে বের হবেন না । রান্নার জন্যে একজন

ঠাকুর আছে। সে বাজারে গেছে মাছের সন্ধানে। হরিচরণ বললেন, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক। কোথাও যাবে না। আমি সন্দেশ নিয়ে আসছি।

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। হরিচরণের প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে ছেলেটাকে কোলে নিতে। কোলে নেবার জন্যে সময়টা ভালো। আশেপাশে কেউ নেই। কেউ দেখে ফেলবে না। তিনি এক মুসলমান কাঠমিস্ত্রির ছেলে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন— এই দৃশ্য হাস্যকর। ধর্মেও নিশ্চয়ই বাধা আছে। যবনপুত্র অস্পৃশ্য হবার কথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্রের নিচে যবনের অবস্থান।

হরিচরণ সন্দেশ এবং এক গ্লাস পানি হাতে ফিরলেন। ছেলেটা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেখানে নেই। জামতলাতেও নেই। পেয়ারা বাগানেও নেই। দিঘির পানিতে ডুবে যায় নি তো? তাঁর বুক ধক করে উঠল। তিনি দিঘির দিকে তাকালেন। দিঘির জল শান্ত। সবুজ শ্যাওলার যে চাদর দিঘি জুড়ে ছড়িয়ে আছে সে চাদরে কোনো ভাঙচুর নেই।

ছেলেটার নাম জানা থাকলে তাকে নাম ধরে ডাকা যেত। তিনি নাম জানেন না। এই কাজটা ভুল হয়েছে। দু'টা পিঁপড়া যখন মুখোমুখি হয় তখন তারা কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করে। বেশিরভাগ সময়ই মানুষরা এই কাজ করে না। একজন আরেকজনকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তিনি পেয়ারা বাগানের দিকে গেলেন। পেয়ারা বাগানের পরই ঘন বেতঝোপ। ছেলেটা বেতঝোপের ওপাশে যায় নি তো?

সেখানেও তাকে পাওয়া গেল না। আকাশের মেঘ ঘন হয়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। হরিচরণ ঘাটের কাছে ফিরে গেলেন। তাঁর হাতে সন্দেশ। সন্দেশ থেকে অতি মিষ্টি গন্ধ আসছে। দারুচিনির গন্ধ না-কি? সন্দেশে গরম মসল্লা দেয়া নিষেধ। দেবীর ভোগে সন্দেশ দেয়া হয়। সেই সন্দেশ বিগুদ্র হতে হয়। এলাচ দারুচিনি দিয়ে বিগুদ্রতা নষ্ট করা যায় না। তাহলে গন্ধটা কিসের? দুধের গন্ধ? ঘন দুধের কি আলাদা গন্ধ আছে?

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আষাঢ় মাসের বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ভিজিয়ে দেবে। দৌড়ে ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। এই বয়সে বৃষ্টিতে ভেজার ফল শুভ হবে না। তারপরেও তিনি ঘাট ছাড়তে পারলেন না। তাঁর কাছে মনে হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন ছেলেটা ভিজতে ভিজতে আসছে।

মুকুন্দ কলাপাতার ঠোঙ্গায় পিঁপড়ার ডিম নিয়ে এসেছে। সে অবাক হয়ে বলল, বিষ্টিত ভিজেন? অসুখ বাধাইবেন। ঘরে যান।

হরিচরণ বললেন, যাব একটু পরে। তুমি সন্দেশ দু'টা ঐ ছেলেটারে দিয়া আস।

কোন ছেলে ?

কাঠমিস্ত্রির ছেলে। আজ আর বর্শি নিয়ে বসব না।

মুকুন্দ অনিচ্ছার সঙ্গে যাচ্ছে। ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। তার এক হাতে পিঁপড়ার ডিম অন্য হাতে সন্দেশ। মাছ ও মানুষের খাদ্য। হরিচরণ হঠাৎ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন, ডিমগুলির জন্যে তাঁর খারাপ লাগছে। এই ডিম থেকে আর কোনোদিন পিঁপড়ার জন্ম হবে না। তারা পৃথিবীর অতি আশ্চর্য রূপ-রস-গন্ধের কিছুই জানবে না। বড়ই আফসোসের কথা। তিনি কি মুকুন্দকে বলবেন ডিমগুলি যেখান থেকে এনেছে সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে ? হয়তো এখনো সময় আছে। জায়গামতো পৌছে দিলে কিছু ডিম থেকে পিঁপড়া জন্মাবে।

মুকুন্দ অনেকদূর চলে গেছে, এখন ডাকলে সে শুনতে পাবে না। তবু তিনি ডাকলেন, মুকুন্দ! মুকুন্দ!

মুকুন্দ শুনতে পেল না। কিন্তু কেউ একজন হাসল। হরিচরণ চমকে হাসির শব্দ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য, লাল প্যান্ট পরা ছেলেটা। সে দিঘির অন্যপ্রান্তে। পাড় বেয়ে পানির দিকে নামছে। বৃষ্টির পানিতে দিঘির পাড় পিচ্ছিল হয়ে আছে। ছেলেটা কি একটা দুর্ঘটনা ঘটাবে ? পা পিছলে পানিতে পড়ে যাবে ? তিনি ডাকলেন, এই, এই— উঠে আস। উঠে আস বললাম। এই ছেলে, এই!

ছেলেটা তাঁকে দেখল। কিন্তু তার দৃষ্টি দিঘির সবুজ পানিতে। তার হাতে কাদামাখা পেয়ারা। সে পেয়ারা পানিতে ধুবে। তিনি উঁচু গলায় আবারো ডাকলেন, এই ছেলে— এই। তখনি ঝপ করে শব্দ হলো। কিছুক্ষণ ছেলেটির হাত পানির উপর দেখা গেল। তারপরেই সেই হাত তলিয়ে গেল। হরিচরণ পুকুরে ঝাঁপ দিলেন।

হরিচরণ কীভাবে দিঘির অন্যপ্রান্তে পৌছলেন, কীভাবে ছেলেটাকে পানি থেকে তুললেন তা তিনি জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন— পানি থেকে তোলায় পর দেখা গেল, ছেলেটার ডানহাত অনেকখানি কেটেছে। সেখান থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে এইভাবেই রক্ত পড়ছিল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ও বাবু! বেঁচে আছিস তো! বলেই পুকুরপাড়ে জ্ঞান হারালেন।

তাঁর জ্ঞান ফিরল নিজের খাটে গভীর রাতে। তাঁর চারপাশে মানুষজন ভিড় করেছে। নেত্রকোনা সদর থেকে এলএমএফ ডাক্তার সতীশ বাবু এসেছেন।

তিনি বুকে স্টেথিসকোপ ধরে আছেন। পাশের ঘর থেকে বৃদ্ধা মায়ালতার কান্না শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধা কারণে অকারণে কাঁদে। হরিচরণ বললেন, ছেলেটা কি বেঁচে আছে ?

মুকুন্দ বলল, বেঁচে আছে।

ছেলেটার নাম কী ?

জহির।

জহির তাহলে বেঁচে গেছে ?

জে আজ্ঞে।

হরিচরণ বললেন, ঠাকুরঘরের তালা খোল। ঘরে বাতি দাও। ঠাকুরঘরে যাব।

মুকুন্দ বিনীতভাবে বলল, সকালে যান। এখন শুয়ে থাকেন। আপনার শরীর অত্যধিক খারাপ।

ঠাকুরঘরের তালা খোল।

গভীর রাতে ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হলো। প্রদীপ জ্বালানো হলো। ছোট ঘর। শ্বেতপাথরের জলচৌকিতে কষ্টিপাথরের রাধা-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ বাঁশি ধরে আছেন। তাঁর কাঁধে মাথা রেখে লীলাময় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রী রাধিকা।

হরিচরণ পদ্মাসন হয়ে বসলেন। মুকুন্দকে বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে আস, আমি একটু দেখব।

ঠাকুরঘরে নিয়ে আসব ? কী বলেন এইসব!

হ্যাঁ, ঠাকুরঘরে নিয়ে আস। সে আমার কোলে বসবে।

মুসলমান ছেলে তো!

হোক মুসলমান ছেলে।

জহিরের মা জহিরকে কোলে নিয়ে এসেছে। সে তার সবুজ শাড়ি দিয়ে ছেলেকে ঢেকে রেখেছে। তার চোখে উদ্বেগ। বাড়িতে এত লোকজন দেখে হকচকিয়ে গেছে। হরিচরণ উঠানের জলচৌকিতে বসেছেন। তাঁর নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। শরীর ঘামছে। তিনি জহিরের মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাগো! আপনার ছেলে কি ভালো আছে ?

জহিরের মা জবাব না দিয়ে ছেলেকে আরো ভালো করে শাড়ি দিয়ে ঢাকল। হরিচরণ বললেন, আমার এখানে ডাক্তার আছে। ছেলেকে দেন, ডাক্তার দেখুক।

আমার ছেলে ভালো আছে।

হরিচরণ মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনেও মুগ্ধ হলেন। কী সুরেলা কণ্ঠ! ঈশ্বর যার প্রতি করুণা করেন সর্ব বিষয়েই করেন। মেয়েটি খালি পায়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। হরিচরণের মনে হলো, মেয়েটির পায়ের কারণেই উঠান ঝলমল করছে। এত রূপবতী কেউ কি এর আগে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে?

মাগো! আপনার ছেলেকে আমার কোলে দেন। আপনার ছেলে কোলে নিয়ে আমি একটা প্রার্থনা করব।

হরিচরণ ঠাকুরঘরে বসে আছেন। তাঁর কোলে জহির। জহির ঘুমাচ্ছে। শান্তির ঘুম। হরিচরণ হাতজোড় করে বললেন, হে পরম পিতা। হে দয়াময়। আজ রাতে আমি তোমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করতে চাই। আমি আমার এক জীবনে যা উপার্জন করেছি, সবই জনহিতকর কার্যে দান করব। আমি যেন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি এইটুকু শুধু তুমি দেখবে। আমি পৃথিবীতে নগ্ন অবস্থায় এসেছিলাম, পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বিদায় নিব।

হরিচরণের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

পরদিন সকালেই একটি মুসলমান ছেলেকে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করানোর অপরাধে হরিচরণকে সমাজচ্যুত করা হলো। সোনাদিয়ার জমিদার শশাংক পালের বৈঠকখানায় সমাজপতিদের বৈঠক বসল। বৈঠকের প্রধান বক্তা ন্যায়রত্ন রামনিধি চট্টোপাধ্যায়। তিনি শাস্ত্র ভালো জানেন। তাঁকে আনা হয়েছে শ্যামগঞ্জ থেকে। শশাংক পাল ঘোড়া পাঠিয়ে আনিয়েছেন। ধর্মবিষয়ক অনাচার তিনি নিতেই পারেন না। ন্যায়রত্ন রামনিধি চট্টোপাধ্যায় কঠিন কঠিন কথা বললেন। মহাভারতের কিছু কাহিনীও বললেন যার সঙ্গে হরিচরণের সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই। সুশোভনার গর্ভে পরিক্ষীতের তিন পুত্র— শল, দল এবং বলের গল্প। শল রাজা হয়েছেন, তিনি ব্রাহ্মণ বামদেবের কাছ থেকে দুই ঘোড়া ধার হিসেবে নিয়ে এসেছেন হরিণ শিকারের জন্যে। হরিণ শিকার হলো কিন্তু রাজা শল দুই ঘোড়া ফেরত পাঠালেন না। বামদেব যখন ঘোড়া ফেরত চাইলেন, তখন রাজা শল বললেন, আপনার ঘোড়ার প্রয়োজন কী? বেদই তো আপনার বাহন।

গল্প শেষ করে ন্যায়রত্ন কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে চোখ খুলে বললেন, হরিচরণের সর্বনিম্ন শাস্তি সমাজচ্যুতি।

অম্বিকা ভট্টাচার্য ক্ষীণস্বরে প্রায়শ্চিত্যের কথা বলে ধমক খেলেন।

ন্যায়রত্ন বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি পূজারি বামুন শাস্ত্র জানো না বলে প্রায়শ্চিত্যের কথা বলল। ঠাকুরঘর যে অপবিত্র করেছে তার আবার প্রায়শ্চিত্য কী?

অধিকা ভট্টাচার্য বললেন, ঠিক ঠিক। এই বিষয়টা মাথায় ছিল না।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন,

কালী করালী চ মনোজবা চ

সুলোহিতা যা চ সুধুম্বর্ণা।

স্কুলিঙ্গিনী বিশ্বরূচি চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥

অধিকা ভট্টাচার্য আবারো বললেন, ঠিক ঠিক।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন, ব্যাখ্যা করব ?

অধিকা ভট্টাচার্য বললেন, আমি প্রয়োজন দেখি না। বিধান শুধু বলে দেন।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন, বিধান আগে একবার বলেছি। আরেকবার বলি। বিধান হলো, হরিচরণ সমাজচ্যুত। হরিচরণের সঙ্গে যারা বাস করে তারাও সমাজচ্যুত। তবে তাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ আছে। তারা টাকা গোবর ভক্ষণ করে এবং সাধ্যমতো দান করে শুদ্ধ হতে পারে। অন্যথায় তাদের সবার জন্য ধোপা-নাপিত বন্ধ। সামাজিক আচার বন্ধ।

হরিচরণ হতাশ চোখে তাকিয়ে আছেন। হরিচরণের পেছনে হাতজোড় করে মুকন্দ দাঁড়িয়ে আছে। সে সামান্য কাঁপছে। তার চোখ ভেজা। মুকন্দের শব্দ করে কাঁদার ইচ্ছা। সে ভয়ে কাঁদতে পারছে না। ন্যায়রত্ন বললেন, হরিচরণ, তুমি কিছু বলতে চাও ?

হরিচরণ না-সূচক মাথা নাড়লেন।

অধিকা ভট্টাচার্য বললেন, হরিচরণের ঘরে রাধা-কৃষ্ণ আছে। ঠাকুর পূজা হয়। এর কী বিধান ?

ন্যায়রত্ন বললেন, মূর্তি সরিয়ে নিতে হবে। গাভী যদি থাকে গাভী নিয়ে নিতে হবে। সে গাভী সেবা করতে পারবে না।

হরিচরণ বললেন, অন্য জাতের মানুষও গাভী পালন করে। আমার জাত গিয়েছে, আমি গাভী পালন করতে পারব না কেন ?

শশাংক পাল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, ভালো যুক্তি। অতি উত্তম যুক্তি।

ন্যায়রত্ন বললেন, ধর্ম যুক্তিতে চলে না। ধর্ম চলে বিশ্বাসে। ধর্মের সপ্ত বাহনের এক বাহন বিশ্বাস।

শশাংক পাল বললেন, এইটাও ভালো যুক্তি।

ন্যায়রত্ন বললেন, ধর্ম থেকে যে পতিত তার স্থান পাতালের রসাতলে। পাতালের সাত স্তর, যেমন— অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। রসাতল হলো পাতালের ষষ্ঠ তল। এই তলে যে পতিত, তার গতি নাই।

হরিচরণ বললেন, পাতালের সপ্তম তলে কার স্থান?

মাতৃহত্যার স্থান। যাই হোক, তোমার সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় আমি যাব না। আমার বিধান আমি দিলাম। তুমি ধনবান ব্যক্তি। প্রয়োজনে কাশি থেকে নতুন বিধান নিয়া আসতে পার।

হরিচরণ বললেন, আমি কোনো বিধান আনব না। আপনার বিধান শিরোধার্য।

শশাংক পাল হুকোয় লম্বা টান দিয়ে বললেন, যাগযজ্ঞ করে কিছু করা যায় না? সপ্তাহব্যাপী যাগযজ্ঞ, নাম সংকীর্তন। হরিচরণ বিত্তবান। সে পারবে।

ন্যায়রত্ন কঠিন গলায় বললেন, না। এই বিষয়ে বাক্যালাপে সময় নষ্ট করা অর্থহীন।

শশাংক পাল বললেন, এটাও ঠিক কথা। তুচ্ছ বিষয়ে সময় হরণ।

হরিচরণ জাতিচ্যুত হলেন সকালে। দুপুরের মধ্যে তাঁর ঘর জনশূন্য হয়ে গেল। মুকন্দ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় হলো। তাকে তিনি দুটো দুধের গাই দিয়ে দিলেন। রান্নাবান্নার জন্যে যে মৈথিলি ঠাকুর ছিল, সে চুলা ভেঙে চলে গেল। নিয়ম রক্ষা করল। পতিতজনের ঘরের চুলা ভেঙে দেয়া নিয়ম। যে-কোনো একটা ঘরের চালাও তুলে ফেলতে হয়। আত্মীয়স্বজনরা সেই চালা মাড়িয়ে চলে যাবে। হরিচরণের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই বলে চালা ভাঙা হলো না।

বৃদ্ধা মায়ালাতাকে সন্ধ্যার মধ্যে তিনি নৌকায় কাশি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মায়ালাতা সঙ্গে করে কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি নিয়ে গেলেন। বিদায়ের সময় হরিচরণ জেঠিমা'কে শেষ প্রণাম করতে গেলেন। মায়ালাতা আঁতকে উঠে বললেন, খবরদার পায়ে হাত দিবি না। তুই ডুবছস, আমারে ডুবাইস না। মায়ালাতার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে হরিচরণের বিশাল বাড়ি হঠাৎ খালি হয়ে গেল।

সন্ধ্যা মিলাতে না মিলাতেই বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস। হরিচরণ পাকা দালানের একপাশে বেতের ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বৃষ্টি

দেখছেন। তামাক খেতে ইচ্ছা করছে, তামাক সাজাবার কেউ নেই। তামাক নিজেকেই সাজাতে হবে। ঘর অন্ধকার। সন্ধ্যার বাতি জ্বালানো প্রয়োজন। কোথায় হারিকেন কোথায় কেরোসিন তিনি কিছুই জানেন না।

বাড়ির পেছনে ছপছপ শব্দ হচ্ছে। ভূত-প্রেত কি-না কে বলবে! ভূত-প্রেতরা শূন্যবাড়ির দখল নিয়ে নেয়— এমন জনশ্রুতি আছে। হাসনাহেনার ঝোপের কাছে সরসর শব্দ হচ্ছে। সাপ বের হয়েছে না-কি? শূন্যবাড়িতে ভূত-প্রেতের সঙ্গে সাপও ঢোকে। বাড়ি পুরোপুরি জনশূন্য হলে আসে বাদুড়। তারা মহানন্দে বাড়ির কড়ি বর্গা ধরে মাথা ঝুলিয়ে দুলতে থাকে। যে বাড়িতে সাপ ও বাদুর সহবাস করে সেই বাড়ির মেঝে ফুঁড়ে অশ্বখ গাছের চারা বের হয়। বাড়িও তখন হয় পতিত।

মানুষের যেমন প্রাণ আছে, বসতবাড়িরও আছে। পতিতবাড়ি হলো প্রাণশূন্য বাড়ি।

ঢং করে কাঁসার পাত্র রাখার শব্দ হলো। হরিচরণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন। চোখ মেলে চমৎকৃত হলেন। জহিরের মা ঘোমটা দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে সে পুরোপুরি ভিজে গেছে। সে এখনো দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টিতেই। বৃষ্টিতে ভিজে মনে হয় মজা পাচ্ছে। জুলেখা কাঁসার থালাভর্তি করে খাবার এনেছে। চিড়া, নারিকেল কোড়া, এক গ্লাস দুধ এবং দুটা কলা। হরিচরণ বললেন, মাগো আজ আমি কিছু খাব না। উপাস দিব।

জুলেখা স্পষ্ট গলায় বলল, আপনি না খেলে আমিও খাব না। আমি এইখানে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ায়ে থাকব।

হরিচরণ হাত বাড়িয়ে দুধের গ্লাস নিলেন।

জুলেখা বলল, ঘর অন্ধকার। বাতি দিতে হবে। হারিকেন কোন ঘরে?

হরিচরণ বললেন, কিছুই তো জানি না।

আপনার সঙ্গে কি কেউ নাই?

না।

আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সব কাজকর্ম কইরা দিব।

প্রয়োজন নাই। তুমি মেয়েমানুষ— এখানে যদি আসো, লোকে নানান কথা বলবে।

আপনি আমারে মা ডেকেছেন। মা ছেলের কাছে আসবে, এতে দোষ নাই।

তোমার ছেলে কোথায়?

ছেলে বাপের সাথে বিরামদি হাটে গেছে। রবারের জুতা কিনবে।

জুলেখা অন্ধকার ঘরে হারিকেন খুঁজছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘর যাচ্ছে। এমনভাবে যাচ্ছে যেন এটা তার নিজের বাড়িঘর। মেয়েটা আবার গুনগুন করে গানও করছে—

কে বা রান্ধে
কে বা বাড়ে
কে বা বসে খায়।
কাহার সঙ্গে শুইয়া থাকলে
কে বা নিদ্রা যায় ?

মনায় রান্ধে
তনায় বাড়ে
আতস বসে খায়
সামুর সঙ্গে শুইয়া থাকলে
সুখে নিদ্রা যায়।।

কী মিষ্টি মেয়েটার গলা! যেন সোনালি বর্ণের কাঁচা মধু ঝরে ঝরে পড়ছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। শত শত জোনাকি বের হয়েছে। ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। শিউলি গাছ জোনাকিতে ঢেকে গেছে। তারা একসঙ্গে জ্বলছে, একসঙ্গে নিভছে। কী মধুর দৃশ্য! হরিচরণের হঠাৎ তার মেয়ের কথা মনে পড়ল। মেয়েটা বেঁচে থাকলে কত বড় হতো? সে দেখতে কেমন হতো? চেহারা মনে পড়ছে না। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল ছিল এটা মনে পড়ছে। কোঁকড়া চুল অলক্ষণ। কারণ দেবী অলক্ষীর মাথায় চুল ছিল কোঁকড়া। তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে অনেকবার বলেছেন— শৈশবের কোঁকড়া চুল বয়সকালে থাকে না। মেয়েটা জীবিত থাকলে এতদিনে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে যেত। বাবার দুঃসংবাদ শুনে সে কি ছুটে আসত? না-কি তার স্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে আটকে দিত? শাস্ত্র বিধান কী বলে? পতিত পিতার সন্তানরাও কি পতিত?

বাবা! আমি যাই?

হরিচরণ চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তাঁর মনে ভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল শিউলি কথা বলছে।

দাঁড়িয়ে আছে জুলেখা। তার মুখ হাসি হাসি। সে হারিকেন খুঁজে পেয়েছে।
তিনটা ঘরে হারিকেন জ্বলছে। শুধু বারান্দায় আলো দেয়া হয় নি। হরিচরণ
বললেন, গান কোথায় শিখেছ মা?

জুলেখা লজ্জিত গলায় বলল, বাপজানের কাছে। আমার বাপজান বাউল।
উনি মালজোড়া গান করেন।

মালজোড়া গান কী?

প্রশ্ন-উত্তর। এক বাউল প্রশ্ন করে আরেকজন উত্তর দেয়। মালজোড়া গানে
আমার বাপজানের সাথে কেউ পারত না।

উনি কি মারা গেছেন?

জে না। বাড়ি থাইকা পালায়া কোথায় জানি গেছে, আর আসে নাই। দশ
বছর হইছে। মনে হয় বিয়াশাদি কইরা নয়া সংসার পাতছে।

জুলেখা খিলখিল করে হাসছে যেন বাবার নতুন সংসার পাতা আনন্দময়
কোনো ঘটনা।

হরিচরণ বললেন, মাগো! তোমার কণ্ঠস্বর অতি মনোহর। একদিন এসে
আমারে গান শুনাবে।

জুলেখা নিচু হয়ে হরিচরণকে কদমবুসি করল।

সময় ১৯০৫। তখন ময়মনসিংহ জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খাজা সলিমুল্লাহ
(ঢাকার নবাব)। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের অধীন। ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা
তখন লর্ড কার্জন। তিনি বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী আসাম,
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী নিয়ে হবে পূর্ববঙ্গ। ঢাকা হবে রাজধানী, চট্টগ্রাম
বিকল্প রাজধানী। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।
ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ ফুঁসে উঠে। বাংলা ভাগ করা যাবে না।

ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হবে— এটিও হিন্দুসমাজ নিতে পারছিল না। পূর্ব
বাংলা চাষার দেশ, তারা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী করবে?

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তখন বাড়ছে। সেই বিরোধ মেটাবার জন্যে
অনেকেই এগিয়ে আসছেন। সেই অনেকের মধ্যে একজন হলেন ঠাকুরবাড়ির
এক কবি, নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান করলেন। সবাই
সবার হাতে রাখি বেঁধে দেবে। কারো মধ্যে কোনো হিংসা-দ্বেষ থাকবে না।

রাশিয়ায় তখন জারতন্ত্র। শেষ জার নিকোলাই আছেন ক্ষমতায়। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। লেনিন জার্মানিতে। তিনি তখনো রাশিয়ায় পৌঁছেন নি। ম্যাক্সিম গোর্কি নামের এক মহান লেখক একটা উপন্যাসে হাত দিয়েছেন। উপন্যাসের নাম 'মা'।

সেইসময়ে ইউরোপের অবস্থাটা একটু দেখি। সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে বাইশ বছর বয়সি এক পেটেন্ট অফিসের কেরানি পদার্থবিদ্যার উপর তিন পাতার এক প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন— Annals of Physics-এ। আলো সম্পর্কে তার নিজের চিন্তাধারা প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে। প্রবন্ধটি পড়ার পর জার্নালের সম্পাদক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কস প্র্যাংক মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারছেন পদার্থবিদ্যার এতদিনকার সব চিন্তাভাবনার অবসান হতে যাচ্ছে। আসছে নতুন চিন্তা। গুরুতম চিন্তা। বাইশ বছর বয়সি পেটেন্ট ক্লার্কের নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।



গ্রামের নাম বান্ধবপুর। পাশের গ্রাম সোনাদিয়া। উত্তরে গারো পাহাড়। পরিষ্কার কুয়াশামুক্ত দিনে উত্তরের দিগন্তরেখায় নীল গারো পাহাড় ঝলমল করে। দু'গ্রামের মাঝখানে মাধাই খাল। এই খাল বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে নদী। মাধাই খাল সোহাগগঞ্জ বাজারে এসে পড়েছে বড়গাঙে। বড়গাঙের অবস্থা বর্ষাকালে ভয়াবহ। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না এমন। লঞ্চ-স্টিমার যাতায়াত করে। সোহাগগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ হয়ে কোলকাতা।

বান্ধবপুর অতি জঙ্গল জায়গা। প্রতিটি বসতবাড়ির চারপাশে ঘন বন। এমন ঘন যে দিনমানে সূর্যের আলো ঢোকে না। শিয়াল বাঘডাশারা মনের আনন্দে ঘোরে। মুরগি চুরিতে এরা বিরাট ওস্তাদ। হঠাৎ হঠাৎ বাঘ দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এইসব বাঘের নাম 'আসামি বাঘ'। এরা বর্ষার পানির তোড়ে আসামের জঙ্গল থেকে নেমে এসে জঙ্গলে স্থায়ী হয়। গৃহস্থের গরু-ছাগল খেয়ে ফেলে।

আসামি বাঘের সন্ধান পাওয়া গেলে নিস্তরঙ্গ বান্ধবপুরে হৈচৈ শুরু হয়। সোনাদিয়া জমিদার বাড়িতে খবর চলে যায়। জমিদার বাবু শশাংক পাল হাতির পিঠে চড়ে মাধাই খাল পার হয়ে বান্ধবপুর উপস্থিত হন। তাঁর হাতে দোনলা উইনস্টন বন্দুক। বাঘমারার অনেক কায়দাকানুন করা হয়। জঙ্গল ঘেরাও দেয়া হয়। ঢাকটোল বাজানো হয়। বাবু শশাংক পাল হাতির পিঠে থেকেই আকাশের দিকে কয়েকবার ফাঁকা গুলি করেন। বাঘ মারা পড়ে না। অন্য কোনো জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। শশাংক পাল হাতির পিঠে করে ফিরে যান। তাঁকে বড়ই আনন্দিত মনে হয়।

বান্ধবপুর পুরোপুরি হিন্দু গ্রাম। সন্ধ্যায় পুরো অঞ্চলে একসঙ্গে উলুধ্বনি উঠে। শাঁখ বাজানো হয়। প্রতিটি সম্পন্ন বাড়িতে নিত্যপূজা হয়। দু'টা কালীমন্দির আছে। একটার নাম বটকালি মন্দির। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে বটগাছের সঙ্গে লাগানো। বিশাল বটবৃক্ষ এক মন্দিরকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে গাছটাকেও মন্দিরের অংশ মনে হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে আয়োজন করে বটকালি মন্দিরে কালীপূজা হয়। পূজার শেষে পাঠা বলি।

বান্ধবপুরে অল্প কয়েকঘর মাত্র মুসলমান। এদের জমিজমা নেই বললেই হয়। বাবুদের বাড়িতে জন খাটে। অনেকেই বাজারে কুলির কাজ করে। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে মালামাল আনা-নেয়া করে। জুম্মাবারে মাথায় টুপি পরে জুম্মাঘরে উপস্থিত হয়। দোয়াকালাম এরা কিছুই জানে না। জানার আগ্রহ বা উপায়ও নেই। তবে শুক্রবারে গম্বীর মুখে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টা তাদের মাথায় ঢুকে আছে। তারা মাওলানা সাহেবের খুতবা পাঠ অতি আগ্রহের সঙ্গে শোনে। নামাজ শেষে শিনির ব্যবস্থা থাকলে অতি আদরের সঙ্গে কলাপাতায় শিনি নেয়। বিসমিল্লাহ বলে মুখে দেয়।

বান্ধবপুরে জুম্মাঘর শাল্লার দশআনি জমিদার নেয়ামত হোসেনের বানিয়ে দেয়া। জুম্মাঘরের মাওলানার জন্যে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিও তিনি ঠিক করেছেন। মাওলানার নাম ইদরিস। বাড়ি ফরিদপুরে। মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিতে তার ভালোই চলে যায়। মুসলমান গৃহস্থ বাড়ি থেকে তাকে ধান দেয়া হয়। যে-কোনো ভালো রান্না হলে তাকে আগে পাঠানো হয়। বিয়েশাদি হলে মাওলানার জন্যে বিশেষ বরাদ্দ থাকে— তবন (লুঙ্গি), পাঞ্জাবি, টুপি, ছাতা।

মাওলানা ইদরিসের সর্বমোট নয়টা ছাতা বর্তমানে আছে। প্রায়ই ভাবেন বুধবার হাঁটে গিয়ে একটা ভালো ছাতা রেখে বাকিগুলি বিক্রি করে আসবেন। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। লোকজন তাকে ভালোবেসে ছাতা দিয়েছে, সেই ছাতা কীভাবে বিক্রি করবেন! ইদরিস মাওলানার বয়স ত্রিশ। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। সাধারণের চেয়ে লম্বা। মাথায় সবসময় পাগড়ি পরেন বলে আরো লম্বা লাগে। নিজের ঘরে তিনি লুঙ্গি-গেঞ্জি পরলেও বাইরে লেবাসের পরিবর্তন হয়। চোস্ট পায়জামা, ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি, চোখে সুরমা, পাগড়ি এবং দাড়িতে সামান্য আতর। দাড়িতে আতর দেয়া সুন্নত। নবিজি দাড়িতে আতর দিতেন।

জুম্মাঘরের বারান্দায় রাখা বেঞ্চে মাওলানা ইদরিস বসে আছেন। তার সামনে কাঠমিস্ত্রি সুলেমান ছেলেকে নিয়ে বসা। ছেলে বসে থাকতে পারছে না। ছটফট করছে। সুলেমান এক হাতে ছেলেকে শক্ত করে ধরে আছে।

মাওলানা ইদরিস বললেন, ছেলের নাম কী?

সুলেমান বলল, জহির।

জহিরের সাথে আর কিছু নাই?

সুলেমান বলল, জে আজ্জে, না।

মাওলানা বললেন, আজ্জে বলতেছ কেন? কথায় কথায় জে আজ্জে বঙ্গা হিন্দুয়ানি। হিন্দুয়ানি দূর করা লাগবে। বলো জে-না।

সুলেমান বলল, জে-না।

মাওলানা বললেন, ছেলের নাম রেখেছ জাহির। এটা তো হবে না। জাহির আল্লাহপাকের ৯৯ নামের এক নাম। এর অর্থ জাহির হওয়া। আল যাহির। নাম বদলাতে হবে। এখন থেকে নাম আব্দুল জাহির। এর অর্থ জাহিরের গোলাম। অর্থাৎ আল্লাহপাকের গোলাম। বুঝেছ?

জি বুঝেছি। এখন ছেলেকে একটা তাবিজ দিয়া দেন। অতি দুষ্ট ছেলে। বনে জঙ্গলে ঘুরে। হরিবাবুর দিঘিতে মরতে বসেছিল। হরিবাবু ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ছেলেরে বাঁচালেন। উনার জন্যে ছেলের জীবন রক্ষা হয়েছে।

মাওলানা ইদরিস বিরক্ত হয়ে বললেন, হরিবাবু তোমার ছেলেকে বাঁচানোর কে? তাকে বাঁচিয়েছেন আল্লাহপাক। মানুষের জীবনের মালিক উনি ভিন্ন কেউ না। বুঝেছ? হায়াত, মউত, রেজেক, ধনদৌলত এবং বিবাহ এই পাঁচটা বিষয় আল্লাহপাক নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। এই বিষয় মনে রাখবা।

সুলেমান হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মাওলানা বললেন, তাবিজ লিখে রাখব, একসময় এসে নিয়ে যাবে।

জে আজ্ঞে।

আবার জে আজ্ঞে?

অভ্যাস হয়ে গেছে, কী করব?

অভ্যাস বদলাতে হবে। ধুতি পরা ছাড়তে হবে। ধুতি হিন্দুর পোশাক। মুসলমানের লেবাস হবে নবিজির লেবাস।

সুলেমান বিড়বিড় করে বলল, এখন আমি যদি পাগড়ি পরে ঘুরি, লোকে কী বলবে?

মাওলানা বললেন, তোমাকে তো পাগড়ি পরতে বলতেছি না। ধুতি পরতে নিষেধ করতেছি। আর যদি পরতেই হয় লুঙ্গির মতো পরবা। এতে দোষ খানিকটা কাটা যায়।

ছেলের মায়ের জন্যে কি একটা তাবিজ দিবেন?

তার কী সমস্যা?

জঙ্গলে ঘুরে। নিজের মনে গীত গায়।

নামাজ রোজা কি করে?

রোজা করে। নামাজের ঠিক নাই।

নামাজ ছাড়া রোজা আর নৌকা ছাড়া মাঝি একই বিষয়। তারে নামাজ পড়তে বলবা।

জি বলব। সুন্দরী মেয়েছেলে, তার উপরে জিনের নজর পড়ছে কি-না এইটা নিয়া আমি চিন্তিত।

জিনের নজর পড়া বিচিত্র না। তাবিজ লেইখা দিব, চিন্তা করবা না।

সুলেমান উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় বেঞ্চের একটা একআনি রাখল। এমনভাবে রাখল যেন মাওলানার চোখে না পড়ে। মাওলানা সাহেবকে দেখিয়ে নজরানা দেয়া বেয়াদবি, আবার কোনো নজরানা না দিয়ে চলে আসাও বেয়াদবি।

মাওলানা ইদরিস সুলেমান চলে যাওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তার ডানপাশে জুম্মাঘর। নিজের একটা জায়গা। অতি আপন। তাকালেই শান্তি শান্তি লাগে। জুম্মাঘরের অবস্থা ভালো না। টিনের চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। একটা দরজা উইপোকা পুরোপুরি খেয়ে ফেলেছে। বাঁশের দরমা দিয়ে ভাঙা দরজা বন্ধ করতে হয়। মিস্তার ভেঙে গেছে। খুতবা আগে মিস্তারে দাঁড়িয়ে পড়তেন, এখন মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়েন। অথচ রসুলে করিম মিস্তারে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করতেন। মুসল্লিদের অজুর ব্যবস্থা নাই। মসজিদের পাশে ডোবার মতো আছে, ডোবায় পাট পচানো হয়, সেখানে অজু করা সম্ভব না। সবচে' ভালো হতো একটা চাপকলের ব্যবস্থা করলে। কে ব্যবস্থা করবে? মাওলানা ইদরিস দশআনির জমিদার নেয়ামত হোসেনের কাছে গিয়েছিলেন। নেয়ামত হোসেন রাগী গলায় বললেন, মসজিদ করে দিয়েছি, বাকি দেখভাল আপনারা করবেন। চাঁদা তুলে করবেন। আমি টাকার গাছ লাগাই নাই। প্রয়োজন হলেই গাছ ঝাড়া দিব আর টুপটুপাইয়া টাকা পড়বে। চান্দা তুলেন, চান্দা।

চাঁদা দেয়ার কোনো মানুষ নাই— এটা বলার আগেই নেয়ামত হোসেন উঠে পড়লেন। সন্ধ্যার পর তিনি বেশিক্ষণ বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না। সম্প্রতি তিনি লখনৌ থেকে পেয়ারীবালা নামের এক বাইজি এনেছেন। সন্ধ্যা থেকে নিশি রাত পর্যন্ত তার সঙ্গে সময় কাটান। এটা নিয়ে কেউ কিছু মনে করে না। জমিদার শ্রেণীর মানুষদের বিলাস ক্রটির মধ্যে পড়ে না। তারা আমোদ ফুটি করবে না তো কে করবে?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মাওলানা ইদরিস বদনায় রাখা পানি দিয়ে অজু করে আযান দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন কেউ আসে কি-না। কেউ এলো না। তিনি মোমবাতি জ্বালিয়ে একাই নামাজ পড়লেন। সালাম ফেরাবার সময় বাতাসে মোমবাতি নিভে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তার বুক ধক ধক করে উঠল। নির্জন মসজিদে জিন নামাজ পড়তে আসে। ইমাম নামাজ পড়াতে ভুল করলে তারা বড় বিরক্ত হয়। চড়থাপ্পড় মারে।

জিনের চেয়েও বেশি ভয় ইবলিশ শয়তানকে। মসজিদের আশেপাশেই এদের চলাচল বেশি। মুসল্লিরা নামাজ শেষ করে বাড়ি যাওয়ার পথে তারা পিছু নেয়। ভয় দেখায়, ক্ষতি করতে চেষ্টা করে।

তিনি কয়েকবার ইবলিশ শয়তানের হাতে পড়েছেন। প্রতিবারই আয়াতুল কুরসি পড়ে উদ্ধার পেয়েছেন। সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত মাসে। এশার নামাজ শেষ করে হারিকেন হাতে বাড়ি ফিরছেন। ফকফকা চাঁদের আলো। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠতে যাবেন, হঠাৎ তার চারদিকে ঢিল পড়তে লাগল। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার ডানদিকে বিশাল বিশাল শিমুল গাছ। বাতাস নেই কিছু নেই, হঠাৎ শুধু একটা শিমুল গাছের ডাল নড়তে লাগল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে একমনে আয়াতুল কুরসি পড়তে শুরু করলেন। আয়াতুল কুরসি একবার শেষ করেন, দু'হাতে শব্দ করে তালি দেন। আবার পড়েন আবার তালি দেন। আয়াতুল কুরসির মরতবা হলো, এই দোয়া পড়ে হাততালি দিলে যতদূর হাততালির শব্দ যায় ততদূর পর্যন্ত খারাপ জিন থাকতে পারে না। আয়াতুল কুরসির এত বড় ফজিলতের কারণ, এই আয়াতে আল্লাহপাকের এমন সব গুণের বর্ণনা আছে যা মানুষের বোধের অগম্য।

তিনবার আয়াতুল কুরসি পাঠ করে মাওলানা চোখ মেললেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। শিমুল গাছের পাতা নড়ছে না। কটু একটা গন্ধ চারদিকে ছড়ানো। নাক জ্বালা করে এমন গন্ধ।

মাগরেবের নামাজ থেকে এশার নামাজের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান অল্প। ঘণ্টাখানিক। এই এক ঘণ্টার জন্যে বাড়ি যাওয়া অর্থহীন। মাওলানা মসজিদেই থাকেন। তার ভয় ভয় লাগে। বনের মাঝখানে মসজিদ। সন্ধ্যার পর থেকে বনের ভেতর নানান ধরনের শব্দ উঠে। কোনোটা পাখির শব্দ, কোনোটা জন্তু জানোয়ারের, আবার কিছু কিছু শব্দ আছে সম্পূর্ণ অন্যরকম। হুম হুম করে এক ধরনের শব্দ মাঝে মাঝে আসে। এই শব্দের সঙ্গে কোনো শব্দের মিল নেই। শব্দ গুনলেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ভয় কাটানোর জন্যে মাওলানা কোরান পাঠ করেন। তিনি ইদানীং শুরু করেছেন কোরান মজিদ মুখস্থ করা। একটা বয়সের পর মুখস্থশক্তি কমে যায়। একই জিনিস বারবার পড়ার পরেও মনে থাকে না। এই সমস্যা তার হচ্ছে। তিনি হাল ছাড়ছেন না। কিছুই বলা যায় না, আল্লাহপাক অনুগ্রহ করতেও পারেন। দেখা যাবে তিনি কোরানে হাফেজ হয়েছেন। সহজ ব্যাপার না। আল্লাহর কথা শরীরে ধারণ করা বিরাট বিষয়। সাধারণ মানুষের শরীর কবর দেয়ার পর পঁচে গলে যায়। কোরানে হাফেজের শরীর পঁচে না।

মাওলানা এশার নামাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে হাতির গলার ঘণ্টার আওয়াজ পেলেন। সোনাদিয়ার জমিদার শশাংক পালের হাতির গলার রূপার ঘণ্টা। অতি মধুর আওয়াজ। তিনি শুনেছেন সোনাদিয়ার জমিদার আরেকটা হাতি কিনেছেন। মাদি হাতি। এখন তিনি দুই হাতি পাশাপাশি নিয়ে চলেন। মাদি হাতিটা থাকে সামনে, পুরুষটা পিছনে। এরা যখন থেমে থাকে তখন না-কি পুরুষ এবং মেয়ে হাতি গুঁড় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চয়ই খুব মধুর দৃশ্য। তিনি এখনো দেখেন-নি। একবার সোনাদিয়ায় যাবেন। দেখে আসবেন।

হাতি নিয়ে কোরান মজিদে একটা সূরা আছে। সূরা ফিল। মাওলানা মনে মনে সূরা আবৃত্তি করে তার বঙ্গানুবাদ করলেন। তাঁর ভালো লাগল।

আলাম তারা কাইফা ফা'আ'লা রাব্বুকা বিআছহবিল ফীল।

হস্তিবাহিনীর সাথে তোমার প্রভু কীরূপ আচরণ করলেন
তাহা কি তুমি লক্ষ কর নাই?

আলাম ইয়াজআ'ল কাইদাহুম ফী-তাদলীল।

তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন নাই?

জঙ্গলের পথ ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠেই মাওলানা শশাংক পালের দেখা পেলেন। হাতির পিঠে শশাংক পাল বসে আছেন। হাতির গায়ের রঙ অন্ধকারে মিশে গেছে। মাওলানা ইদরিসের মনে হলো, জমিদার শশাংক পাল শূন্যের উপর বসে আছেন।

মাওলানা ইদরিস বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আদাব। বিধর্মীকে আসসালামু আলায়কুম বলা নিষেধ। তাদের বেলায় আদাব। আদাব শব্দের অর্থ আছে কিনা তিনি জানেন না।

শশাংক পাল বললেন, কে?

মাওলানা বললেন, জনাব আমার নাম ইদরিস। আমি জুম্মাঘরের ইমাম।

আমার অঞ্চলে গরু কাটা নিষেধ এটা জানো তো?

জি জনাব জানি।

নিষেধ জেনেও অনেকে গরু কাটে। গভীর জঙ্গলের ভেতর এই কাজ করে মাংস ভাগাভাগি করে। এরকম সংবাদ যদি পাও আমাকে জানাবে। আমি ব্যবস্থা নিব। ভালো কথা, হরিচরণ মুসলমান হয়েছে এরকম একটা খবর পেয়েছি। খবরটা কি সত্য?

সত্য না, জনাব।

আচ্ছা, ঠিক আছে। পথ ছাড়, আমি যাব।

মাওলানা পথ ছেড়ে রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আরো দূরে সরে গেলেন।

শশাংক পাল হাতি নিয়ে হরিচরণের বাড়িতে এসেছেন। হাতি দুটাই সঙ্গে এনেছেন। শশাংক পালের সঙ্গে তাঁর এস্টেটের দুই ম্যানেজার এসেছেন। একজন হুকোবরদার এসেছে। পান বান্দেশ একজন এসেছে। তার কাজ নানান মসলা দিয়ে পান বানানো। শশাংক পালের তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে। অন্যের হুকোয় তিনি তামাক খান না।

শশাংক পালের বয়স চল্লিশ। শরীরের উপর নানান অত্যাচারের কারণে বয়স অনেক বেশি দেখায়। চেহারা বালকভাব আছে, তবে চোখ জ্যোতিহীন। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে হাতকাঁপা রোগ হয়েছে। গাছের পাতা কাঁপার মতো হাতের আঙুল প্রায়ই থরথর করে কাঁপে। শশাংক পাল এই কারণেই শীত-গ্রীষ্ম সবসময় মখমলের চাদরে শরীর ঢেকে রাখেন।

হরিচরণ জমিদার বাবুকে অতি যত্নে বৈঠকখানায় বসিয়েছেন। তাকে তামাক দেয়া হয়েছে। একজন পাখাবরদার পেছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছে। এত বড় জমিদার হঠাৎ তার বাড়িতে কেন এই কারণে হরিচরণ ধরতে পারছেন না। একটা অনুমান তিনি অবশ্যি করছেন— ব্রিটিশরাজকে খাজনা দেবার তারিখ এসে গেছে। শশাংক পাল হয়তো খাজনার পুরো টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। খাজনা জমা দেবার সময়ই শুধু জমিদাররা ধনবানদের খাতির করেন।

হরিচরণ!

জে আজ্ঞে।

নতুন হাতি খরিদ করেছি। গৌরীপুরের মহারাজার কাছ থেকে কিনলাম। তিনি কিছুতেই বিক্রি করবেন না। মহারাজা বললেন, আমি কি হাতি বেচাকেনার ব্যবসা করি? তোমার হাতি পছন্দ হয়েছে নিয়ে যাও, কিছু দিতে হবে না। আমি বললাম, ঐটা হবে না। নগদ আট হাজার টাকা উনার খাজাঞ্চির কাছে জমা দিয়ে হাতি নিয়ে চলে এসেছি। ভালো করেছি না?

হরিচরণ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

হাতির নাম রেখেছি বং। পুরুষটার নাম চং, মাদিটার নাম বং। দুইজনে মিলে বংচং। হা হা হা। ভালো করেছি না?

জে আজ্ঞে, ভালো।

শশাংক পাল গলা নামিয়ে বললেন, এখন মূল কথায় আসি। হঠাৎ হাতি কেনার কারণে আমি কিঞ্চিৎ অর্থসংকটে পড়েছি। আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে খাজনা পৌছতে হবে। পাঁচ হাজার টাকার সমস্যা। টাকাটা দিতে পারবে?

হরিচরণ মুখ খোলার আগেই শশাংক পাল বললেন, আমি জিনিস বন্ধক রেখে টাকা নিব। বৎ থাকবে তোমার কাছে বন্ধক। একটা বন্ধকনামা তৈরি করে এনেছি। স্ট্যাম্পে পাকা দলিল। আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি। বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

হরিচরণ বললেন, আপনি নিজে এসেছেন এই যথেষ্ট। বন্ধকনামা লাগবে না। হাতিও রেখে যেতে হবে না।

শশাংক পাল বললেন, এই কাজ আমি করি না। বন্ধকনামায় আমি দস্তখত করি নাই। টিপসই দিয়েছি। ইদানীং দস্তখত করতে পারি না। হাতকাঁপা রোগ হয়েছে, শুনেছ বোধহয়। জনসমক্ষে বিরাট লজ্জায় পড়ি বিধায় চাদরের নিচে হাত লুকিয়ে রাখি। এখন বলো টাকাটা কি দিতে পারবে?

হরিচরণ বললেন, এত টাকা আমি সঙ্গে রাখি না। সকালে আপনার বাড়িতে দিয়ে আসব।

শশাংক পাল আরো কিছুক্ষণ থাকলেন। শরবত খেলেন, পান খেলেন। কিছুক্ষণ গল্প করলেন।

উড়াউড়া শুনতে পেলাম তোমাকে না-কি সমাজচ্যুত করেছে। কথাটা কি সত্যি?

হরিচরণ একবার ভাবলেন বলেন, সমাজচ্যুতির ঘটনা আপনার বাড়িতেই ঘটেছে। আপনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। তারপর মনে হলো এই মানুষকে পুরনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। তিনি কিছুই মনে রাখতে পারেন না।

শশাংক পাল বললেন, তুমি না-কি সবার সামনে এক মুসলমান ছেলেকে চাটাচাটি করেছ? গালে চুমা দিয়েছ?

হরিচরণ জবাব দিলেন না।

শশাংক পাল গলা নামিয়ে বললেন, আবার কার কাছে যেন শুনলাম সেই মেয়ের মা রাইত নিশুখে তোমার ঘরে আসে। তুমি একা থাক, রাইত নিশুখে তোমার ঘরে মেয়েছেলে আসা তো ভালো কথা না। সমাজ থেকে পতিত হবে।

হরিচরণ বললেন, পতিত তো আছিই। নতুন করে কী হবো? তা ছাড়া রাইত নিশুখে আমার কাছে কেউ আসে না। ঐ মেয়ে আমারে বাবা ডাকে। আমি তাকে কন্যাসম দেখি।

শশাংক পাল মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, নিজের কন্যা ছাড়া আর কেউ কন্যাসম না। এইটা খেয়াল রাখবা।

আচ্ছা রাখব।

তোমার বাড়িতে তো কোনো লোকজন দেখলাম না। সবাই কি তোমাকে ত্যাগ করেছে?

করেছে। করাই স্বাভাবিক। আমার জাত নাই। সমাজ নাই।

শশাংক পাল বললেন, এইসব নিয়ে চিন্তা করবে না। যার টাকা আছে সে সমাজ কিনবে। আর আমি তো আছি। বামুন পণ্ডিতকে ডেকে ধমক দিয়ে দিব, নিমিষে সে অন্য বিধান দিবে। হা হা হা।

প্রচণ্ড শব্দে শশাংক পাল হাসছেন। অথচ এই হাসি প্রাণহীন। মনে হচ্ছে কোনো একটা যন্ত্রের ভেতর থেকে শব্দ আসছে।

হরি!

জে আজ্ঞে।

তোমার এখানে যদি মদ্যপান করি তোমার কি অসুবিধা আছে?

কোনো অসুবিধা নাই।

কলিকাতা থেকে ভালো রাম আনিয়েছিলাম। খাবে একটু?

আমি মদ্যপান করি না।

ভালো। খুব ভালো। মদ্য সর্বগুণনাশিনী। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ— আমার হয়েছে হাতকাঁপা রোগ। এই সঙ্গে স্মৃতিভ্রংশ রোগ। কিছু মনে থাকে না।

মদ্যপান ছেড়ে দেন।

কেন ছাড়ব? পৃথিবীতে আমরা এসেছি ভোগের জন্যে। ভোগ নিবৃত্তি না হলে বারবার জন্মাতে হবে। আবার জন্মানোর ইচ্ছা নাই। এই জন্যেই ঠিক করেছি, এই জীবনেই সমস্ত ভোগের নিষ্পত্তি করব।

শশাংক পালের জন্যে মদ্যপানের আয়োজন তার লোকজন অতি দ্রুত করে ফেলল। মেঝেতে কার্পেট বিছানো হলো। তাকিয়া এবং কোলবালিশ নামানো হলো। গ্লাস নামল, বোতল নামল। ধূপদানে ‘অগরু’ পোড়ানো হলো। হুকোয় মেশকাত আধুরী তামাক ভরা হলো।

শশাংক পাল তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গ্লাস হাতে নিতে নিতে বললেন, বরফ ছাড়া এইসব জিনিস খেয়ে কোনো মজা নাই। বরফকলের সন্ধানে আছি।

কলিকাতায় সাহেবপাড়ায় বরফকল পাওয়া যায়। কেরোসিনে চলে। অত্যধিক দাম। তারপরেও সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিনব। ভালো করেছি না?

কথায় কথায় 'ভালো করেছি না' বলা শশাংক পালের মুদাদোষ। প্রশ্নটা তিনি করেন, তবে জবাবের জন্যে অপেক্ষা করেন না। তিনি নিশ্চিত যা করেছেন, ভালোই করেছেন।

হরি!

যে আজ্ঞে।

মহাভারতের যযাতির কথা মনে আছে? তার জীবনটাই ছিল ভোগের। বৃদ্ধ হয়ে গেলে ভোগের তৃষ্ণা মেটে না। তখন সে তিনপুত্রকে ডেকে বলল, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের যৌবন আমাকে দিয়ে আমার জরা গ্রহণ করবে। আমি আরো ভোগ করতে চাই। কেউ রাজি হয় না। একজন রাজি হলো। সেই একজনের নামটা কি তোমার মনে আছে, হরি?

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রাজি হলো। তার নাম পুরু।

ঐটা ছিল গর্ধব। গর্ধবটা রাজি হয়েছে। হা হা হা। মহা গর্ধব। হা হা হা।

হাসতে হাসতে শশাংক পালের হেঁচকি উঠে গেল। হেঁচকি থামানোর জন্যে পানি খেতে হলো। মাথায় পানি দিতে হলো। তবু হেঁচকি থামে না। হেঁচকি দিতে দিতেই তিনি হাতিতে উঠে চলে গেলেন। মাদি হাতি লোহার শিকলে বাঁধা থাকল জামগাছের সঙ্গে। হাতির সঙ্গে আছে হাতির সহিস। সহিস মুসলমান, নাম কালু মিয়া। ছোটখাটো মানুষ। অতি বিনয়ী। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না।

হরিচরণ বললেন, এত বড় হাতি আর তুমি ছোটখাটো মানুষ। তোমার কথা কি মানে?

কালু মিয়া বলল, জে কর্তা, মানে। আমি তার চোখের সামনে থাকলেই সে ঠাণ্ডা থাকে। চোখের আড়াল হলেই অস্থির হয়।

এত বড় জন্তু বশ করলে কীভাবে?

আদর দিয়ে। সব পশু আদর বুঝে। মানুষের চেয়ে বেশি বুঝে।

মানুষ কম বুঝে?

জে কর্তা।

মানুষ কম বুঝে কেন?

মানুষের আদর করলে মানুষ ভাবে আদরের পেছনে স্বার্থ আছে। পশু স্বার্থ বুঝে না।

কালু মিয়া! আমি যদি হাতিটাকে আদর করি সে বুঝবে ?
অবশ্যই বুঝবে । হাতির অনেক বুদ্ধি । আর হাতি আদরের কাঙ্গাল ।
হরিচরণ হাতির গায়ে হাত রাখলেন । হাতি মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখল ।
হরিচরণ বললেন, কেমন আছিস গো বেটি ?

হাতি গুঁড় ঝাঁকালো ।
হরিচরণ বললেন, তুই আমার বাড়ির অতিথি । তুই কী খেতে চাস বল ।
কালু মিয়া বলল, কর্তা, আপনার প্রত্যেকটা কথাই হে বুঝছে । জবান নাই
বইলা উত্তর দিতেছে না ।

হরিচরণ বললেন, তোমার হাতি কী খেতে সবচে' পছন্দ করে বলো । আমি
তাই খাওয়াব ।

এক ধামা আলুচাল দেন । এক ছড়ি কলা দেন, আর নারকেল দেন । আপনি
নিজের হাতে তারে খাওয়াটা দিবেন, বাকি জীবন সে আপনারে ভুলবে না ।

হরিচরণ নিজের হাতে হাতিকে খাবার খাওয়ালেন । কালু মিয়া বলল, কর্তা,
আপনার আদর হে বেবাকটাই বুঝছে ।

তুমি জানলে কীভাবে ?
দেহেন না একটু পর পর গুঁড় দিয়া আপনারে ধাক্কা দিতাছে । এইটা তার
খেলা । পছন্দের মানুষের সাথে এই খেলা সে খেলে ।

অল্প কয়েক ঘণ্টায় হাতিটার উপর তার অস্বাভাবিক মায়া পড়ে গেল ।
তৃতীয় দিনে সেই মায়া যখন অনেক গুণ বেড়েছে, তখনি হাতি ফেরত নেবার
জন্যে শশাংক পালের দুই ম্যানেজার উপস্থিত । তারা টাকা নিয়ে আসে নি,
এসেছে খালি হাতে ।

তাদের কাছেই হরিচরণ জানলেন যে, হাতি বন্ধক রেখে টাকা নেবার
কোনো ঘটনা ঘটে নি । বন্ধকনামায় যে টিপসই আছে সেটা শশাংক পালের না ।
তিনি যদি ইচ্ছা করেন বন্ধকনামা নিয়ে কোর্টে যেতে পারেন ।

হরিচরণ বললেন, হাতি নিয়ে যাও ।
কালু মিয়ার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল । সে হরিচরণের পা ছুঁয়ে বিদায়
নিল ।

হরিচরণ তাকে রূপার একটা টাকা দিয়ে বললেন, তোমার স্বভাব আচার-
আচরণ আমার পছন্দ হয়েছে । হাতির সঙ্গে থাক বলেই হাতির স্বভাব তোমার
মধ্যে এসেছে । হাতি উত্তম প্রাণী । তুমিও উত্তম ।

শশাংক পাল হাতি ফিরিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি হরিচরণের উপর নানাবিধ নির্যাতনের চেষ্টা করলেন। সমাজচ্যুতির বিষয়টা পাকাপাকি করলেন। তাঁর ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়ে গেল। সোহাগগঞ্জে পাটের গদিতে আঙুন লোণে সব পুড়ে গেল। কিছু বিশ্বাসী কর্মচারী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। হরিচরণ দমলেন না। নাপিত বন্ধ হওয়ার কারণে তিনি চুল-দাড়ি কাটা বন্ধ করলেন। তার মাথাভর্তি চুল-দাড়ি গজাল। চেহারা ঋষি ঋষি হয়ে গেল।

মানুষ এমন প্রাণী যে দ্রুত নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। হরিচরণ একা জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকালে গদিতে বসেন। ব্যবসার কাজকর্ম দেখেন। গদির হিন্দু কর্মচারীদের জাতের সমস্যা হয় নি। তারা আগের মতোই আছে। তাদের দুপুরের খাবার সময় হলেই কিছু সমস্যা হয়। তখন হরিচরণকে গদিঘর থেকে চলে আসতে হয়। তিনি নিজের বাড়িতে রান্না করতে বসেন। ভাত, আলু সেদ্ধ, ঘি। কোনো কোনো দিন ডিম। খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ির আশেপাশে হাঁটতে বের হন। দেখাশোনার কেউ না থাকায় বাড়ির চারদিকে ঘন জঙ্গল হয়েছে। ঘাস এবং কচুবনে বাড়ি প্রায় ঢাকা পড়ার মতো অবস্থা। কোনো একদিন মনে হয় বাড়ি পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যাবে। সেটাও মন্দ কী! বনের ভেতর হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে চমকে যাবার মতো ঘটনাও ঘটে। ঘটনাগুলো নিয়ে তার ভাবতে ভালো লাগে। একবার হিজল গাছের গোড়ায় কয়েকটা সাপের ডিম দেখলেন। আকাশী নীল রঙের ডিম। মাঝে মাঝে হলুদ ছোপ। দেখে মনে হয়, রঙ-তুলি দিয়ে কেউ ডিমগুলো ঐঁকেছে। সাপের মতো ভয়ঙ্কর একটা প্রাণীর ডিম এত সুন্দর কেন এই বিষয় নিয়ে ভেবে ভেবে অনেক সময় পার করলেন। কোলকাতায় চিঠি পাঠালেন সাপের উপর বই বুকপোস্টে পাঠানোর জন্যে।

বই পড়ার অভ্যাস তার ছিল না। এই অভ্যাস ভালোমতোই হলো। বেশির ভাগই ধর্মের বই, সাধুদের জীবনকাহিনী। পাশাপাশি ইতিহাসের বই। সন্ধ্যার পর তার প্রধান কাজ— হারিকেন জ্বালিয়ে বই পড়া। সুর করে কাশীদাসীর মহাভারত পড়তেও তার ভালো লাগে। তার মনে হয় রামায়ণ পাঠের সময় দেহধারী না এমন অনেকেই চারপাশে জড়ো হয়। তারা নিঃশব্দে মন দিয়ে পাঠ শোনে—

হেতায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া ।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জুনে চাহিয়া ।।
শুন ভাই ধনঞ্জয়, না বুঝি কারণ ।
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ ।।
শীঘ্রগতি বৃকোদরে কর অব্বেষণ ।
বুঝি ভীম কারো সনে করিতেছে রণ ।।

জহির ছেলেটা প্রায়ই আসে। তার প্রধান ঝাঁক পুকুরের পানি। হরিচরণ তাকে সাঁতার শেখালেন। এই কাজটা করেও খুব আনন্দ পেলেন।

নিঃসঙ্গ জীবনে বনে-জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে জহিরের সঙ্গে গল্প করা তাঁর জন্যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা। ছেলেটা অতিরিক্ত বুদ্ধিমান। বড় হলে তার এই বুদ্ধি থাকবে কি-না এটা নিয়েও হরিচরণ চিন্তা করেন। ছেলেটার সঙ্গে জ্ঞানের কথা বলতেও হরিচরণের ভালো লাগে। কারণ এই ছেলে কথাগুলো বুঝতে পারে।

জহির!

হঁ।

মানুষের যেমন জীবন আছে গাছেরও আছে— এটা জানো?

জানি।

কীভাবে জানো?

আপনি বলেছেন।

মানুষের সঙ্গে গাছের অনেক প্রভেদ আছে। প্রভেদ হলো অমিল। অমিলগুলো কি জানো?

না।

ভেবে ভেবে বলো। চিন্তা করে বলো।

গাছ কথা বলতে পারে না।

হয়েছে। আর কী?

গাছ হাঁটতে পারে না।

হয়েছে। আর কী?

জানি না।

চিন্তা করে বলো। কখনো হুট করে ‘জানি না’ বলবে না। চিন্তা করো।

ছেলেটা গম্ভীর ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করে। দেখতে এত ভালো লাগে! আচ্ছা জন্মান্তর কি আছে? এমন কি হতে পারে তাঁর মৃত কন্যা মুসলমান ঘরে পুরুষ হয়ে জন্ম নিয়েছে? তার মেয়ের মাথায় চুল ছিল কোঁকড়ানো। এই ছেলেরও তাই। আগের জন্মে মেয়েটা পানিতে ডুবে মরেছিল। এই জন্মেও একটা ঘটনা ঘটেছে, তবে এই জন্মে সে রক্ষা পেয়েছে।

মাঝে মাঝে হাটের দিন যখন সুলেমান হাটে যায়, জুলেখা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসে। তার হাতে থাকে শলার ঝাড়ু। ছেলের হাতেও থাকে ঝাড়ু। দু’জনে

বিপুল উৎসাহে বাড়িঘর ঝাঁট দিতে থাকে। ঘর পরিষ্কার পর্ব শেষ হলে জুলেখা খিচুড়ি রাঁধতে বসে। হরিচরণ তখন পাশেই থাকেন। রান্না দেখেন। রান্নার সময় জুলেখা নানান গল্প করে।

জগতের সবচে' সহজ রান্না খিচুড়ি। হাতের কাছে যা আছে সব হাঁড়িতে দিয়া জ্বাল। একটু নুন, দুই একটা কাঁচামরিচ। ব্যস।

ছেলে প্রশ্ন করে, জগতের সবচে' কঠিন রান্না কী ?

ভাত। ঝরঝরা নরম ভাত রান্না বড়ই কঠিন। একটু জ্বাল বেশি হইলে ভাত গলগলা। জ্বাল কম ভাত শক্ত চাউল।

কোনো কোনো দিন জুলেখা তার বাবার গল্প শুরু করে। কবে কোনদিন তার বাপজান কবিগানের প্রশ্নোত্তরে বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন—তার গল্প। এই সময় জুলেখার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। হরিচরণের মনে হয়, মেয়েটার মুখ থেকে আলো বের হচ্ছে।

বুঝলেন বাবা! জাগ্রির আলী, সেও বিরাট নামি মালজোড়ার গায়ন, আমার বাপজানরে কঠিন একখান সোয়াল করল— মাটি ক্যামনে সৃষ্টি হইল ?

বাপজান সঙ্গে সঙ্গে বলল, (জুলেখা এই অংশে গান শুরু করল)

ওরে গুণধন!

প্রশ্নের কী বিবরণ! সভার মাঝে করিব বর্ণন।

ধৈর্য ধরে শুনো ওরে শ্রোতাবন্ধুগণ।

দুই দিনে হয় মাটির জনম

চারদিনে আল্লাহ সব করিলেন সৃজন।

বিশ্বয়কর হলেও সত্যি, হঠাৎ হঠাৎ অধিকাচরণ উপস্থিত হন। তিনি প্রতিবারই সমাজ থেকে পতিত হবার পর উদ্ধারের একেকটা উপায় নিয়ে আসেন। পুকুরঘাটে বসে গলা উঁচিয়ে ডাকেন— হরি! আছো ? খোঁজ নিতে আসলাম। আছো কেমন ?

ভালো আছি।

তোমার উপর কাজটা অন্যায় হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়েছি, একটা সোনার চামচে গোবর নিয়া চামচের হাতলে তিনবার দাঁতে কামড় দিলেই শরীর শুদ্ধ হয়। তারপর সেই চামচ কোনো এক সৎ ব্রাহ্মণকে দান করে দিতে হয়। কাশির এক পণ্ডিতের বিধান।

কেমন পণ্ডিত ?

বিরাট পণ্ডিত। চার-পাঁচটা ন্যায়রত্ন রামনিধি পানিতে গুলে খেয়ে ফেলতে পারে। তোমার শরীর শুদ্ধির ব্যবস্থা কি করব ?

যাক আরো কিছু দিন। তাছাড়া আপনি শরীর শুদ্ধি করলে তো হবে না। কেউ মানবে না। কাশির পণ্ডিতদের লাগবে।

তাও কথা। একটা কাজ করি, কোনো শুভদিন দেখে দু'জনে কাশি চলে যাই। তোমার তো অর্থের অভাব নাই। আমারে খরচ দিয়া নিয়া গেলা। পুণ্যধাম কাশি কোনোদিন দেখি নাই। দেখার শখ আছে।

নিয়ে যাব আপনাকে। কথা দিলাম। আমি উদ্ধার পাই বা না পাই—
আপনার শখ মেটাব।

অধিকাচরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, হরিচরণের জন্যে তার সত্যি খারাপ লাগে।

হরিচরণের জন্যে আরেকজন মানুষের খুবই খারাপ লাগে, তার নাম ধনু শেখ। সে লঞ্চঘাটের টিকেট বাবু। মাঝে মাঝে টুকটাক ব্যবসা করে। কোলকাতা থেকে এক ড্রাম লাল কেরোসিন নিয়ে এসে বান্ধবপুরে বিক্রি করে। লঞ্চ পাঠিয়ে দেয় শুকনা মরিচ। এতে বাড়তি আয় যা হয় তা সে ব্যয় করে নতুন বিয়ে করা স্ত্রীর পেছনে। পাউডার, স্নো, শাড়ি, রূপার গয়না। লঞ্চঘাটের কাছেই টিনের এক চালায় তার সংসার। স্ত্রীর নাম কমলা। ধনু শেখ স্ত্রীর খুবই ভক্ত। তার একমাত্র স্বপ্ন একদিন সে একটা লঞ্চ কিনবে। সেই লঞ্চ নারায়ণগঞ্জ সোহাগগঞ্জ চলাচল করবে। লঞ্চের নাম এমএল কমলা। এমএল হলো মোটর লঞ্চ। সেই লঞ্চ কমলা নামের যে-কোনো যাত্রী যদি উঠে সে যাবে ফ্রি। তার টিকেট লাগবে না।

হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ লঞ্চের টিকেট কাটতে এলেই ধনু শেখ কোনো না কোনো প্রসঙ্গ তুলে হরিচরণের জাত নষ্টের কথা তুলবে।

বাবু, আপনে বলেন— মনে করেন সুন্দর একটা কুত্তার বাচ্চা রাস্তায় হাঁটতেছে। আপনে 'আয় তু তু' বললেন, সে লাফ দিয়া আপনার কোলে উঠল। আপনার জাইত কিন্তু গেল না। মুসলমানের এক বাচ্চা কোলে নিছেন— জাইত গেল। এখন মীমাংসা দেন— মুসলমানের বাচ্চা কি কুত্তার চাইতে অধম ?

যে সব বাবুদের এ ধরনের প্রশ্ন করা হয় তারা বিব্রত হন না। বিরক্ত হন। কেউ কেউ বলেন, তুমি টিকেট বাবু। তুমি টিকেট বেচবা। এত কথা কী ?

জাইত জিনিসটা কী বুঝায়া বলেন। শরীরের কোন জায়গায় এই জিনিস থাকে, ক্যামনে যায় ? জিনিসটা কি ধুয়াশা ?

তুমি বড়ই বেয়াদব। তোমার মালিকের কাছে বিচার দিব। চাকরি চইল্যা
যাবে। না খায়া মরবা।

মরলে মরব। তয় জাইতের মীমাংসা কইরা দিয়া মরব।

তুমি জাইতের মীমাংসা করার কে? জাইতের তুমি কী বুঝ?

আমি না বুঝলেও আপনারা তো বোঝেন। আপনারা মীমাংসা দেন।

বেয়াদবির কারণেই ধনু শেখের টিকেট বাবুর চাকরি চলে গেল। লঞ্চ
কোম্পানির মালিক নিবারণ চক্রবর্তী তাকে ধর্মপাশা অফিসে ডেকে পাঠালেন।
বিরক্ত গলায় বললেন, ধনু, উইপোকা চেন?

ধনু শেখ ভীত গলায় বলল, চিনি।

উইপোকাকার পাখা কেন উঠে জানো?

উড়াল দিবার জন্যে।

না। উইপোকাকার পাখা উঠে মরিবার তরে। তুমি উইপোকা ছাড়া কিছু না।
তোমার পাখা উঠেছে। তুমি সবেরে জাইত পাইত শিখাইতেছ?

ধনু শেখ বলল, কর্তা ভুল হইছে।

ভুল স্বীকার পাইলে কানে ধর। কানে ধইরা একশ'বার উঠবোস কর।

ধনু দেরি করল না। কানে ধরে উঠবোস শুরু করল। সে ধরেই নিয়েছিল
চাকরি চলে যাবে। কানে ধরে উঠবোসের মতো অল্প শাস্তিতে পার পেয়ে যাচ্ছে
দেখে সে আনন্দ। তার হাঁটুতে ব্যথা, উঠবোস করতে কষ্ট হচ্ছে। এই কষ্ট
কোনো কষ্টই না।

নিবারণ চক্রবর্তী খাতা দেখছিলেন। খাতা থেকে মাথা তুলে বললেন,
একশ'বার কি হইছে?

জে কর্তা হইছে।

এখন বিদায় হও। তোমার চাকরি শেষ। লঞ্চঘাটায় নতুন টিকেট বাবু
যাবে। আইজ দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়বা। নতুন টিকেট বাবু পরিবার নিয়া
উঠবে।

আমার চাকরি শেষ?

এতক্ষণ কী বললাম?

ধনু শেখ বলল, চাকরি যদি শেষই করবেন কান ধইরা উঠবোস করাইলেন
কী জন্যে?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন, আগেই যদি বলতাম চাকরি শেষ তাহলে কি কানে ধরে উঠবোস করতা ? এই জন্যে আগে বলি নাই।

ধনু শেখ বলল, এইটা আপনার ভালো বিবেচনা।

তোমার ছয়দিনের বেতন পাওনা আছে। নতুন টিকেট বাবুর কাছে থাইকা নিয়া নিবা। তার নাম পরিমল। যাও, এখন বিদায়। জটিল হিসাবের মধ্যে আছি।

ধনু শেখ অতি দ্রুত গভীর জলে পড়ে গেল। স্ত্রীকে নিয়ে উঠার কোনো জায়গা নেই। নিজের খরুচে স্বভাবের কারণে সঞ্চয়ও নেই।

সে কিছুদিন বাজে মালের দোকান চালাবার চেষ্টা করল। স্ত্রীর জায়গা হলো নৌকায়। ছইওয়ালা নৌকার দু'পাশ শাড়ি দিয়ে ঘিরে তার ভেতরে সংসার।

ধনু শেখের দোকান চলল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ তার দোকান থেকে কিছু কেনে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, মুসলমানওরাও না। রাতে নৌকায় ঘুমাতে গিয়ে ধনু শেখ হতাশ গলায় বলে, বউ কী করি বলো তো।

নতুন কোনো ব্যবসা দেখবেন ?

কী ব্যবসা ?

ঘোড়াতে কইরা ধর্মপাশা থাইকা মাল আনবেন।

এই ব্যবসা করব না বউ। যারা ঘোড়ার মাল টানাটানি করে তারার স্বভাব হয় ঘোড়ার মতো। ঘোড়া হওয়ার ইচ্ছা নাই।

নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে গিয়া তার পায়ে উপুড় হইয়া পইড়া দেখবেন। পুরান চাকরি যদি ফেরত পান।

ধনু শেখ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, লাভ নাই। উনার নতুন টিকেট বাবু কাজ ভালো জানে। তার জায়গায় আমারে দিবে না।

এখন উপায় ?

তাই ভাবতেছি।

অতিদ্রুত অবস্থা এমন পর্যায়ে গেল যে চাল ডাল কেনার টাকায় টান পড়ল। এর মধ্যে আরেক বিপদ কমলা গর্ভবতী। তার সারাক্ষণ ভুখ লাগে। এটা সেটা খেতে ইচ্ছা করে। একদিন অর্ধেকটা মিষ্টি কুমড়া কাচা খেয়ে ফেলল।

ধনু শেখ বলল, বৌ, তোমারে তোমার মায়ের কাছে পাঠায়া দেই ?

কমলা বলল, আপনারে এতবড় বিপদে ফেইলা আমি বেহেশতেও যাব না। তাছাড়া আমার মা'র নিজেরই খাওন জুটে না। আমার কাছে স্বর্ণের একটা চেইন আছে। এইটা বিক্রি করেন।

ধনু শেখ স্বর্ণের চেইন বিক্রি করতে পারল না। বাজারের একমাত্র স্বর্ণকারের দোকানের মালিক শ্রীধর বলল, এর মধ্যে সোনা বলতে কিছু নাই। সবই ক্ষয়া গেছে।

ধনু শেখ বলল, কর্তা! না খায়া আছি। স্ত্রীর সন্তান হবে।

শ্রী ধর বলল, তোমার সাথে বাণিজ্য করব না। তুমি জাত নিয়া অন্দ মন্দ কথা বলো। তোমার সাথে বাণিজ্য করলে শ্রী গণেশ বেজার হবেন। দোকান লাটে উঠব। আমিও তোমার মতো না খায়া থাকব।

বন্দক রাইখা কিছু দেন।

বন্দক রাখতে হয় ভগবানের নামে, তোমার আবার ভগবান কী?

ধনু শেখ বলল, তাও তো কথা।

ভাদ্র মাসের একদিন ধনু শেখকে সত্যি সত্যি উপাসে যেতে হলো। সারাদিনে দুই মুঠ চিড়া ছাড়া খাওয়ার নেই। তাও ভালো কমলা খেতে পেরেছে। চাল যা ছিল তাতে একজনের মতো ভাত হয়েছে। ফ্যান ভাতে লবণ ছিটিয়ে কমলা এত আগ্রহ করে খেল যে ধনু শেখের চোখে পানি এসে গেল। সে গম্ভীর গলায় বলল, বউ, একটা জটিল সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

কমলা আগ্রহ নিয়ে বলল, কী সিদ্ধান্ত?

ডাকাতি করব। ডাকাতি বিনা পথ নাই।

কমলা হাসতে শুরু করেই হাসি বন্ধ করে ফেলল। ধনু শেখের মুখ গম্ভীর। চোখ জ্বল জ্বল করছে।

ডাকাতি করবেন?

হঁ।

ডাকাইতের দল থাকে। আপনার দল কই?

দল লাগে না।

কমলা বলল, আমার সন্তানের কসম দিয়া একটা কথা বলি।

ধনু শেখ কিছু বলল না।

আপনি সত্যিই ডাকাতি করবেন?

হঁ।

এই সময় ঘাট থেকে কেউ একজন ডাকল, এটা কি ধনু শেখের নাও?

ধনু নৌকা থেকে বের হয়ে দেখে হরিচরণ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ধনু বলল, বাবু আদাব।

আদাব । তোমার সঙ্গে গল্প করার জন্যে আসছি । নায়ে উঠি ?

উঠেন । আমার সাথে কী গফ করবেন ? আমি একজন ছল্লু । জুতার শুকতলি ।

হরিচরণ নৌকায় উঠলেন । ধনু শেখ পাটাতনে গামছা বিছিয়ে দিল । হরিচরণ বসতে বসতে বললেন, কুকুরের বাচ্চা এবং মানুষের বাচ্চা নিয়া তুমি যে এক মীমাংসা দিয়েছ, মীমাংসাটা আমার মনে লেগেছে ।

মীমাংসার উত্তর কি আপনার কাছে আছে ?

আছে ।

বলেন শুনি ।

হরিচরণ বললেন, মানুষের তুলনা মানুষের সাথে হবে । অন্য কোনো প্রাণীর সঙ্গে হবে না । একটা মন্দ মানুষের সঙ্গে অন্য একটা মন্দ মানুষের বিবেচনা হবে । কোনো মন্দ প্রাণীর সঙ্গে হবে না । বুঝেছ ?

বোঝার চেষ্টা নিতেছি ।

হরিচরণ বললেন, আরো একটা কথা আছে ।

বলেন শুনি ।

মানুষের তুলনায় পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী তুচ্ছের তুচ্ছের তুচ্ছ । খুলিকনার চেয়েও তুচ্ছ । খুলিকনা গায়ে তুললেও কিছু না, গা থেকে ফেলে দিলেও কিছু না ।

ধনু বলল, আপনি জ্ঞানী মানুষ । জ্ঞানী মানুষের জ্ঞানী কথা । আমি তুচ্ছ, তুচ্ছের কথাও তুচ্ছ ।

শুনেছি তুমি দুর্দর্শায় পড়েছ । তোমার চাকরি চলে গেছে । আমার কাছ থেকে সাহায্য নিবে ?

ধনু বলল, কী সাহায্য করবেন ?

কী ধরনের সাহায্য তুমি চাও ?

ধনু বিরক্ত গলায় বলল, পারলে একটা লঞ্চ কিন্যা দেন । সোহাগগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ রুটে চলবে । লঞ্চের নাম এমএল কমলা ।

কমলা কে ?

আমার পরিবারের নাম ।

হরিচরণ বললেন, আমি তোমাকে লঞ্চ কিনে দিব । তুমি লঞ্চ ব্যবসার সঙ্গে অনেকদিন ছিলে । এই ব্যবসা তুমি জানো । তোমার বুদ্ধি আছে । চিন্তাশক্তি আছে । তুমি পারবে । আমি ব্যবসায়ী মানুষ । না বুঝে কিছু করি না ।

হতভম্ব ধনু শেখ বলল, সত্যি লঞ্চ কিনে দিবেন ?

হ্যাঁ।

লা ইলাহা ইল্লালাহ্। এইগুলো কী বলেন ?

পর্দার আড়াল থেকে কমলা মুখ বের করেছে। সে মনের উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। হরিচরণ বললেন, মা, ভালো আছে ?

কমলা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার মুখে কথা আটকে গেছে।

ধনু শেখ বলল, আমার কেমন জানি লাগতেছে। শরীর দিয়া গরম ভাপ বাইর হইতেছে। আপনে কিছু মনে নিবেন না। আমি নদীতে একটা ঝাঁপ দিব।

ধনু শেখ ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে গেল।

জমিদার বাবু শশাংক পাল পরের বছরের সদর জমা দিতে পারলেন না। তাঁর জমিদারি বসতবাটিসহ নিলামে উঠল। হরিচরণ সাহা নগদ অর্থে সেই জমিদারি কিনে নিলেন।

এক সন্ধ্যায় দু'টা হাতি নিয়ে কালু মিয়া হরিচরণের বাড়িতে উপস্থিত হলো। হরিচরণ বললেন, কালু, ভালো আছ ?

কালু মিয়া বলল, কর্তা, আপনে আপনার বেটির কাছে গিয়া দাঁড়ান। দেখেন আপনার বেটি আপনার মনে রেখেছে।

হরিচরণ হাতির পাশে দাঁড়াতেই হাতি তার ঘাড়ের গুঁড় তুলে দিল। হরিচরণের চোখ ভিজে উঠল।

এই অঞ্চলের প্রথম স্কুল (পরে কলেজ) হলো জমিদার বাবু শশাংক পালের বসত বাড়ি। হরিচরণের নাম হলো ঋষি হরিচরণ। তিনি তার জীবনযাত্রা পদ্ধতিও সম্পূর্ণ বদলে ফেললেন। একবেলা স্বপাক নিরামিষ আহার। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত পূজার ঘরে চোখ বন্ধ করে আসন। বিলাস তাঁর জীবনে আগেও ছিল না, এখন আরো কমল। তবে নতুন ধরনের একটা বিলাস যুক্ত হলো। তিনি হাতির পিঠে চড়ে সপ্তাহে একদিন মনার হাওর পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়া শুরু করলেন।

হাতি হেলতে দুলতে তাকে নিয়ে যায়। মনার হাওরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। ঘণ্টাখানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে আসে।

জমিদারি কেনার কিছুদিনের মধ্যে ন্যায়রত্ন রামনিধি হরিচরণের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি হরিচরণকে বললেন, আপনার জন্যে সুসংবাদ আছে। বিরাট সুসংবাদ। আমি গয়াতে বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম। দিকপাল এক বেদান্তকারের কাছ থেকে বিধান নিয়ে এসেছি।

হরিচরণ বললেন, কী বিধান ? আমি আবার জাতে উঠতে পারব ?
পারবেন । তার জন্যে সাতজন সৎ ব্রাহ্মণকে সাতটা স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে ।
সাতটা বৃষ উৎসর্গ করতে হবে এবং পূণ্যধাম কাশিতে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি
স্থাপন করতে হবে । রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি হতে হবে স্বর্ণের ।
হরিচরণ বললেন, আমার জাতে উঠার কোনো ইচ্ছা নাই ।
ন্যায়রত্ন বললেন, কী বলেন এইসব ? আপনার তো মক্ষিক বিকৃতি হয়েছে !
হরিচরণ বললেন, তা খানিকটা হয়েছে । আপনি এখন গাত্রোথান করলে
ভালো হয় । আমার কাজকর্ম আছে ।
হরিচরণ এই সময় সামান্য লেখালেখিও শুরু করলেন । দিনপঞ্জি জাতীয়
লেখা ।

অদ্য চৌবিংশতম আষাঢ় ১৩১৩ বঙ্গাব্দ

ইংরেজি ১৯০৮ সোমবার

গৃহদেবতায় নিবেদনমিদং । কিছুদিন যাবৎ ঈশ্বরের স্বরূপ
অনুসন্ধান করিতেছি । ইহা বৃথা অনুসন্ধান । অতীতে কেউ
এই অনুসন্धानে ফল লাভ করেন নাই । আমিও করিব না ।
তঁাহার বিষয়ে যতই অনুসন্ধান করিব ততই অন্ধকারের
গভীর তলে নিমজ্জিত হইব । মানবের কাছে তঁাহার এক
রূপ । মানব তঁাহাকে মানবের মতোই চিন্তা করিবে । তঁাহার
মধ্যে মানবিক গুণ এবং দোষ আরোপ করিবে । আবার পশু
তাহাকে পশুরূপেই চিন্তা করিবে । বৃক্ষরাজী চিন্তা করিবে
বৃক্ষরূপে । এটা আমাদের চিন্তার দৈন্য, অন্য কিছু নয় ।

হরিচরণ যখন এই রচনা লিখছেন তখন ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শক্তি যেন রয়,
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা
বহিতে পারি এমন যেন হয় ।

বর্মাফেরত এক যুবা পুরুষ কোলকাতার কাছেই বাজে-শিবপুরে বাসা
নিয়েছেন । তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন । উপন্যাসটির বিষয়ে তাঁর বিরাট
অস্বস্তি । উপন্যাসটি নিম্নমানের হয়েছে । তিনি ঠিক করলেন এই উপন্যাস প্রকাশ
করবেন না । তিনি পাণ্ডুলিপি তালাবদ্ধ করে ফেলে রাখলেন । উপন্যাসের নাম
'দেবদাস' ।

সেই বৎসরই (১৭ মে) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করলেন।

সেই বৎসরের জুন মাসের দুই তারিখে কোলকাতার কাছেই মানিকতলায় ইংরেজ সরকার একটা বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার করেন। অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। অরবিন্দের গ্রেফতারের খবরে পুরো বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।

কমরেড মোজাফফর আহমেদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আমার জীবন ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি’-তে লিখলেন—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ থেকে আন্দোলনকারীরা প্রেরণা লাভ করিতেন। এই পুস্তকখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম’ গান। তাতে আছে—

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
তুংহি দুর্গা দশপ্রহর ধরিণী...

স্বদেশ বন্দনার নামে আন্দোলনকারীরা মুসলিম বিদ্বেষমূলক এই ‘বন্দে মাতরম’ গানকে জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে চালু করে। একেশ্বরবাদী কোনো মুসলিম কি করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারত ? এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনোদিন বুঝতে পারেন নি।



ধনু শেখের লঞ্চটি একতলা। কাঠের বডি। যাত্রী ধারণক্ষমতা পঞ্চাশ। লঞ্চ চলাচল শুরু করেছে ধর্মপাশা সোহাগগঞ্জ রুটে। লঞ্চের নাম 'এমএল বাহাদুর'। 'কমলা' নামই ঠিক ছিল, এর মধ্যে কমলার এক পুত্রসন্তান হওয়ায় নাম বদলেছে। ছেলের নাম বাহাদুর। তার নামে লঞ্চের নাম। মেয়েছেলের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া ঠিক না। এতে দোষ লাগে। আয় উন্নতি হয় না।

মাওলানা ইদরিস দোয়া পড়ে লঞ্চ বখশে দিয়েছেন। কালিবাড়ির পুরোহিত এবং অধিকা ভট্টাচার্যও জবাবুল, গঙ্গাজল দিয়ে লঞ্চ শোধন করে দিলেন। সারেঙের ঘরে গণেশ মূর্তি বসানো হয়েছে। যাকে বলে আটঘাট বেঁধে নামা। নিজের লঞ্চ নিয়ে ধনু শেখ গেল ধর্মপাশায়। প্রাক্তন মুনিব নিবারণ চক্রবর্তীর আশীর্বাদ নিতে। উনাকে লঞ্চটা দেখানোর শখও আছে। নিবারণ চক্রবর্তী বিস্থিত হয়ে বললেন, তুমি লঞ্চ কোম্পানি খুলেছ ?

ধনু বলল, জে কর্তা। একটাই এখন লঞ্চ— নাম দিয়েছি বাহাদুর। দোতলা একটা স্টিল বডি কিনার শখ আছে, যদি আপনার আশীর্বাদ পাই।

এত টাকা পাইলা কই ? চুরি-ডাকাতি করছ নাকি ?

ডাকাতি করার ইচ্ছাই ছিল, হঠাৎ একজন কিছু টাকা দিল।

সেই একজনটা কে ?

জমিদার হরিচরণ বাবু।

কাছাখোলা জমিদার ? কাছা খুইলা চলাফেরা করে। খড়ম পইরা জমিদারি দেখতে যায়। সে শুনছি দুনিয়ার টাকা উড়াইতেছে। তোমারে হঠাৎ টাকা দিল কেন ? তার মতলবটা কী ?

ক্যামনে বলব। কেউ কানে ধইরা উঠবোস করায়, কেউ লঞ্চ কিন্যা দেয়— কারণ বোঝা মুশকিল। দুনিয়া বড় জটিল।

ঠিক কইরা বলো তো, তুমি আমার আশীর্বাদ নিতে আসছ, নাকি অন্যকিছু ? অন্যকিছুই না।

হরিচরণ কি আমার পিছে লাগছে ? তার সাথে তো আমার কোনো বিবাদ নাই। আমার ব্যবসা। তার জমিদারি।

উনার কথা মনেও আনবেন না। সাধু মানুষেরে টানাটানি করা ঠিক না। উনি বিরাট সাধু।

আমারে উপদেশ দিবা না। কচুগাছের পাতা বড় হইলেই সে বটগাছ হয় না। কচুগাছ কচুগাছই থাকে।

অবশ্যই থাকে। খাঁটি কথা বলেছেন। এজাজত দেন, বিদায় হই।

ধনু শেখ হাসিমুখে বের হলো। নিজের লঞ্চে করে সোহাগগঞ্জ ফিরল। সারেং-এর ঘরে বাতাস খেতে খেতে ফেরা। এর মজাই অন্যরকম।

প্রথম মাসের লাভের অর্ধেক সে দিতে গেল জমিদার হরিচরণকে। হরিচরণ বললেন, আমি তো তোমার সঙ্গে লঞ্চে ব্যবসায় নামি নাই।

ধনু শেখ বলল, তাহলে টাকা দিয়েছেন কী জন্যে ?

তোমাকে সাহায্য করার জন্যে। বিরাট বিপদে পড়েছিল। নিরন্ন দিন কাটাইতেছিল। আমার কারণেই বিপদে পড়ল, তাই সামান্য সাহায্য।

টাকা ফেরত দেয়া লাগবে না ?

অন্যভাবে ফেরত দিবা। ডিসিট্রিষ্ট বোর্ডের রাস্তায় মনিহারদির পুলটা ভাঙা। ভালো কাঠের পুল বানায় দিবা।

পুল আপনি বানান।

আমার বানানো পুলে হিন্দুরা কেউ উঠবে না।

না উঠলে না উঠবে। আপনার কী ?

হরিচরণ চুপ করে রইলেন। ধনু শেখ তীব্রগলায় বলল, পুলে উঠবে না এইটা একটা কথা কইলেন ? এরাই আমি থাপড়ায় পুলে তুলব। আমার নাম ধনু।

হরিচরণ বললেন, ধনু নামের মানুষজন কি থাপড়াইতে ওস্তাদ ?

ধনু জিব কাটল। মুরব্বির মানুষের সামনে বেআদবি কথা বলা হয়েছে। তাকে আরো সাবধান হতে হবে। সে এখন বিশিষ্টজন। বিশিষ্টজনরা কথাবার্তা বলবে সাবধানে। হিসাব করে। একটা কথার আগে দশটা হিসাব।

বান্ধবপুরের আরেক বিশিষ্টজন মনিশংকর দেওয়ান। থাকেন কোলকাতায়। কাপড়ের ব্যবসা করেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামে ফিরেন। বিরাট আয়োজনে

দুর্গাপূজা হয়। প্রতিবছরই তিনি পূজা উপলক্ষে কিছু না কিছু মজার আয়োজন করেন। কখনো যাত্রা, কখনো ঘেঁটু গান, ম্যাজিক শো, সাহেববাড়ির বাজনা। শোনা যাচ্ছে, এ বছর তিনি বাইজি নাচাবেন। দেবী দুর্গার সঙ্গে পূজা গ্রহণের জন্যে কার্তিকও আসেন। কার্তিক আবার বারবনিতাদের গান-বাজনার ভক্ত। তাঁর অবসর সময় কাটে স্বর্গের নটিদের নৃত্যগীতাদি শুনে। দেবী দুর্গার সঙ্গে মায়ের বাড়ি বেড়াতে এসে নিরামিষ সময় কাটানো তাঁর পছন্দ না। পূজার উদ্যোক্তারা তাঁর আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা নেন।

দুর্গাপূজার শুরুতে হরিচরণের কাছে এসে উপস্থিত হলেন শশী ভট্টাচার্য। থলেথলে পূজারি বামুন না। মোটামুটি ফিটফাট যুবা পুরুষ। বালক বালক চেহারা, মাথাভর্তি চুল। হালকা পাতলা শরীর। গায়ের বর্ণ গৌর। গায়ে হলুদ রঙের আলপাকার কোট। পায়ে চকচকে বার্নিশ করা জুতা। থিয়েটারের নায়কের পাট তাকে যে-কোনো সময় দেয়া যায়।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, আমি ব্রাহ্মণ বিধায় আপনাকে প্রণাম করতে পারছি না। আপনি প্রণম্য ব্যক্তি।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার পরিচয়?

আমার নাম শশী ভট্টাচার্য। পিতা এককড়ি ভট্টাচার্য, মাতার নাম যশোদা। তাঁরা বিত্তবান মানুষ। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাঁরা সম্প্রতি আমাকে ত্যাগ করেছেন বিধায় আমি দেশে বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এক দু'দিন থেকে চলে যাব যদি অনুমতি দেন।

আমি অনুমতি দেবার কে?

আপনার আশ্রয়ে থাকব বলেই অনুমতি প্রয়োজন। গাছতলায় তো থাকতে পারি না। মাথার উপর চাল প্রয়োজন।

হরিচরণ বললেন, আমি জাতিচ্যুত মানুষ। একজন ব্রাহ্মণ সন্তান আমার সঙ্গে থাকতে পারেন না।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, সেটাও কথা।

হরিচরণ বললেন, আমি অন্যকোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেই?

তাহলে খুবই ভালো হয়। আমি নির্জনে থাকতে পছন্দ করি। জলের কাছাকাছি হলে ভালো হয়। কলিকাতায় আমাদের বসতবাড়ি গঙ্গার উপরে। জল দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে।

হরিচরণ বললেন, মাধাই খালের কাছে আমার টিনের ছোট ঘর আছে, সেখানে থাকতে পারেন। একজন পাচকের ব্যবস্থা করে দিব।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, পাচক ফাচক লাগবে না। আমি নিজেই রাঁধব। ভালো কথা, আমি অন্যের সাহায্য বা ভিক্ষা গ্রহণ করি না। এই যে কয়েকদিন থাকব তার বিনিময়ে আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

হরিচরণ বললেন, কিছুই করার প্রয়োজন নেই। আপনি অতিথি। অতিথি হলেন নারায়ণ।

সব অতিথি নারায়ণ না। কিছু অতিথি বিভীষণ। যাই হোক, আমি কর্মী মানুষ। আপনার হয়ে কাজকর্ম করে দিতে আমার কোনোই অসুবিধা নেই। শুনেছি আপনি জমিদারি কিনেছেন। আমি জমিদারির কাগজপত্র দেখে দিতে পারি। খাজনা আদায় বিলি ব্যবস্থা এইসবও করতে পারি।

আপনার পিতার কি জমিদারি আছে ?

ছিল। এখন নাই। এখন তাঁরা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। তাঁরা থাকেন ধর্মকর্ম নিয়ে, আমি থাকি বাদ্যবাজনা নিয়ে। এই নিয়েই তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ।

আপনি বাদ্যবাজনা করেন ?

হুঁ, ব্যাঞ্জো বাজাই।

আপনার ঐ বাঞ্জে কি কলের গান ?

ঠিক ধরেছেন। কলের গান। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির পঞ্চাশটার মতো থাল আমার কাছে আছে।

যন্ত্রটার নাম শুনেছি, কোনোদিন দেখি নাই।

আপনার কি বাদ্যবাজনার শখ আছে ?

হরিচরণ বললেন, শখ নাই।

জমিদার মানুষদের শখ থাকে। আপনে কেমন জমিদার ?

হরিচরণ হাসিমুখে বললেন, আমি খারাপ জমিদার।

আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। আশা করি আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় শুভ হবে।

বাবা-মা ছেড়ে চলে আসা এই আলাভোলা ছেলেটাকে হরিচরণের অত্যন্ত পছন্দ হলো। তাঁর বারবারই মনে হলো, এই ছেলেটা যদি এখানে স্থায়ী হয়ে যেত! একটা স্কুল শুরু করা তাঁর অনেকদিনের বাসনা। ছেলেটাকে দিয়ে স্কুলের কাজ ধরা যায়। জমিদারি কাজেও মনে হয় এই ছেলে দক্ষ হবে। সমস্যা একটাই, কিছু মানুষ থাকে কলমিশাকধর্মী। শিকড়বিহীন। কলমিশাক জলে ভাসে বলে শিকড় বসাতে পারে না। জলের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই ছেলেটাও মনে হচ্ছে জলেভাসা।

শশী ভট্টাচার্য নিজেকে কর্মী মানুষ বলে পরিচয় দিয়েছিল। বাস্তবেও সেরকম দেখা গেল। অতি অল্প সময়ে হরিচরণের টিনের ঘর ভেঙে মাধাই খালের আরো কাছে নিয়ে গেল। এত কাছে যে বাড়ির বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসলে পা খালের পানি স্পর্শ করে। বোপঝাড় কেটে নয়াবসতি। কাঠের কাজ করে দিচ্ছে মিস্ত্রি সুলেমান। করাত দিয়ে কাঠ কাটতে কাটতে সে অবাক হয়ে নতুন মানুষটাকে দেখছে। নতুন মানুষটা হাত-পা নেড়ে বিড়বিড় করে কী বলে এটা তার জানার শখ। তার ধারণা যাত্রা থিয়েটারের কোন পার্ট।

শশী ভট্টাচার্য হাত-পা নেড়ে যা করে তার নাম কবিতা আবৃত্তি। গানবাজনা ছাড়াও তার কবিতা লেখার বাতিক আছে। তার লেখা কবিতা 'উপসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সুলেমান কাজ বন্ধ করে হা করে তাকিয়ে আছে। শশী ভট্টাচার্য একটা জবাগাছের দিকে তর্জনী উঠিয়ে বলছে—

সেই তুমি মুক্ত আজি জয়ধ্বনি উঠে বাজি
অমরাবতীর সভাতলে,
হৃন্দে হৃন্দে কানপাতি উর্বশী নাচিছে মাতি
মহেন্দ্রের লুপ্ত আঁখিজলে।

পূজার ঢাকের বাদ্য বাজতে শুরু করেছে।

তাক দুমাদুম তাক দুমাদুম শব্দে বান্ধবপুর মুখরিত। আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে মুসলমানদের মধ্যেও। ছেলেপুলেরা মহানন্দে পূজাবাড়ির উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কিছু মনে করছে না। বয়স্ক মুসলমানরা আসছে। আজ তাদেরও কেউ কিছু বলছে না।

গারোদের ধুতি পরা মনিশংকর বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যেককেই আলাদা করে বলছেন, শেখের পো'রা প্রাসাদ না নিয়া কেউ যাবে না। সইক্যাকালে বাইজি নাচ হবে। দলে-বলে আসবা। মেয়েছেলেদের জন্যে চিকের পর্দার ব্যবস্থা আছে।

পূজা নিয়ে জুলেখার সংসারে বিরাট অশান্তি শুরু হলো। জুলেখা স্বামীর কাছে বায়না ধরেছে পূজা উপলক্ষে তাকে নতুন লাল শাড়ি দিতে হবে। সুলেমান বিস্মিত হয়ে বলেছে, তোমারে শাড়ি দিব কেন? তুমি কি হিন্দু?

জুলেখা বলল, ঈদেও শাড়ি দেন নাই।

পয়সার অভাবে দিতে পারি নাই।

এখন তো পয়সা হইছে। নয়া বাবুর কাম করেছেন। এখন দেন।

সুলেমান মহাবিরক্ত হয়ে বলেছে, পূজার সময় শাড়ি দেয়া ইসলামধর্মে নিষেধ আছে। বিরাট পাপ হয়। যে শাড়ি দিবে সে যেমন পুলসেরাত পার হইতে পারবে না, যে শাড়ি পরবে সেও পারবে না।

আপনেরে বলছে কে?

বলাবলির কিছু নাই। সবাই জানে। প্রয়োজনবোধে জুম্মাঘরের ইমাম সাবরে জিগাইতে পার।

আমার একটা মাত্র শাড়ি। ভিজা শাড়ি শরীরে শুকাইতে হয়।

সুলেমান দরাজ গলায় বলল, পূজার ঝামেলা শেষ হোক, একটা শাড়ি কিন্যা দেব।

লাল শাড়ি।

সন্তান হওনের পর লাল শাড়ি পরা নিষেধ। জিন-ভূতের নজর থাকে লাল শাড়ির দিকে। তারপরেও দেখি বিবেচনা করে।

জুলেখার লাল শাড়ির শখ অদ্ভুত উপায়ে মিটে গেল। মনিশংকর বাবু পূজা উপলক্ষে বিতরণের জন্যে একগাদা শাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। পূজার দ্বিতীয় দিনে তিনি ঝাঁকাভর্তি শাড়ি নিয়ে বিতরণে বের হলেন। হিন্দু মুসলমান বিবেচনায় না এনে সবাইকে শাড়ি দিতে লাগলেন। জুলেখার বাড়ির সামনে যখন এসে দাঁড়ালেন তখন দুপুর। জুলেখা পুকুরে গোসল সেরে ভেজা শাড়িতে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। সুলেমান বাড়িতে নেই। তার ছেলেও বাড়িতে নেই। মনিশংকরকে দেখে গায়ে লেপ্টে থাকা ভেজা শাড়ির জন্যে তার লজ্জার সীমা রইল না। তার ইচ্ছা করল আবার ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়তে।

মনিশংকর বললেন, মাগো, আমি আপনার পুত্র। পুত্রের কাছে মাতার লজ্জার কিছু নাই। দেবী দুর্গা আপনার জন্যে সামান্য উপহার পাঠিয়েছেন। গ্রহণ করলে ধন্য হবো।

জুলেখা বলল, কে পাঠিয়েছেন?

আমার মাধ্যমে দেবী দুর্গা পাঠিয়েছেন।

আমি মুসলমান।

জানি। মাগো, পছন্দ করে একটা শাড়ি নেন।

জুলেখা কাঁপা কাঁপা হাতে একটা শাড়ি নিল। তার কাছে মনে হলো সে তার জীবনে এত সুন্দর শাড়ি দেখে নি। জবাফুলের মতো লালশাড়ি। আঁচলে সোনালি ফুল। ফুলগুলি থেকে সোনালি আভা যেন ঠিকরে পড়ছে। শাড়ি নিয়ে সুলেমান কোনো ঝামেলা করল না। পূজার পরে তাকে শাড়ি কিনে দিতে হবে না এই স্বস্তিই কাজ করল।

হরিচরণের বাড়িতে মনিশংকর উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর হাত ধরে আছে পুত্র শিবশংকর। ছেলেটা বাবার ন্যাওটা। বাবাকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারে না। পূজাবাড়ির হৈচৈ ফেলে সে বাবার হাত ধরে ঘুরছে।

হরিচরণ ব্যস্ত হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াতেই মনিশংকর বললেন, আমার বাড়িতে মা এসেছেন। আপনি নাই কেন?

হরিচরণ বললেন, আমি কীভাবে যাব? আমি পতিতজন।

মনিশংকর বললেন, মা'র কাছে কেউ পতিত না। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

পূজামণ্ডপে আমি উপস্থিত হলে অন্যরা আপনাকে ত্যাগ করবে।

অন্যরা ত্যাগ করলে করবে। মা আমাকে ত্যাগ করবে না। আপনি যদি আমার সঙ্গে না যান আমি কিন্তু আপনার উঠানে উপবাস করব।

দীর্ঘদিন পর হরিচরণের চোখে পানি এসে গেল। মনিশংকর ছেলেকে বললেন, যাও কাকাকে প্রণাম কর।

হরিচরণ আঁতকে উঠে বললেন, না। না।

মনিশংকর বললেন, আপনি অতি পুণ্যবান ব্যক্তি। আপনাকে প্রণাম না করলে কাকে করবে!

মূল মণ্ডপের বাইরে উঠানে হাঁটুগেড়ে জোড় হস্তে হরিচরণ বসেছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। ঘণ্টা এবং ঢাকের আওয়াজ কানে আসছে। নাকে আসছে ধূপের গন্ধ। তাঁর উচিত দেবী দুর্গার বন্দনা করা। তিনি একমনে বলছেন, কৃষ্ণ কোথায়? আমার কৃষ্ণ! কৃষ্ণ।

এইসময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মোটামুটি অপরিচিত লোকজনের মধ্যে পরিচিত একজনকে দেখে দৌড়ে এসে তাঁর কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জহির। হরিচরণ অনেকদিন আগে দেখা স্বপ্নে ফিরে গেলেন। তাঁর মনে হলো, সত্যি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার কোলে। জ্ঞান হারিয়ে উঠানে পড়ে গেলেন। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। পূজারি ঠাকুর ঘোষণা করলেন, ধর্মচ্যুত মানুষ দেবীর

কাছাকাছি আসায় এই বিপত্তি। দেবী বিরক্তি হয়েছেন। দেবীর বিরক্তি দূর করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। আলাদা পূজাপাঠ লাগবে।

হরিচরণ দুর্বল শরীরে শুয়ে আছেন। তাঁকে দেখতে এসেছেন শশী ভট্টাচার্য। ডাক্তার কবিরাজের মতো গম্ভীর ভঙ্গিতে নাড়ি ধরে থেকে বলেছে, আপনার কি মৃগী আছে? হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মৃগীর লক্ষণ।

আমার মৃগী নাই।

নাই, হতে কতক্ষণ? সাবধানে থাকবেন। একডোজ ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমিয়ে থাকুন। ওষুধের কারণে সুনিদ্রা হবে। ক্লান্তি দূর হবে।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি ডাক্তারি কর না-কি?

শশী ভট্টাচার্য বললেন, আমি শখের চিকিৎসক। বায়োকেমিক চিকিৎসা করি। বায়োকেমিক চিকিৎসা বিষয়ে কি আপনি কিছু জানেন?

না।

আমাদের বায়োকেমিক শাস্ত্রে ওষুধের সংখ্যা মাত্র বারো। বারোটা ওষুধে সর্বরোগের উপশম। লক্ষণ বিচার করে ঠিকমতো ওষুধ দিতে পারলেই হলো।

শশী ভট্টাচার্য মনে হয় বান্ধবপুরে স্থায়ী হয়ে গেছেন। বান্ধবপুরে প্রাইমারি স্কুল চালু হয়েছে। তিনি তার শিক্ষক। ছাত্রসংখ্যা তিন। তাঁর প্রধান কাজ ছাত্র সংগ্রহ করা। অপ্রধান কাজ হরিচরণের জমিদারির হিসাব-নিকাশ দেখা।

শশী ভট্টাচার্যের বর্তমান পরিচয়— পাগলা মাস্টার।

যে মাস্টার কালো একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ছেলেপুলে দেখলে পেছন থেকে এসে ঘাড় চেপে ধরে বলে— তোর বাবার কাছে আমাকে নিয়ে যা। তোকে স্কুলে ভর্তি করাব। পেট এত মোটা কেন? পেটভর্তি কৃমি গজগজ করছে। হা কর— ওষুধ খাবি।

রোগী পালাতে চেষ্টা করে। ঝেড়ে দৌড় দেয়। পেছনে পেছনে দৌড়ান শশী মাস্টার।

একদিন রোগীর পেছনে ছুটতে শশী মাস্টার শশাংক পালের সামনে পড়ে গেল। শশাংক পাল বললেন, আপনার পরিচয়?

শশী মাস্টার বললেন, আমার বর্তমান পরিচয় আমি একজন দৌড়বিদ। রোগী ধরার জন্যে দৌড়াচ্ছি।

ও আচ্ছা! আপনি পাগলা মাস্টার। আপনার কথা শুনেছি। আমার নাম শশাংক পাল। জমিদারি ছিল। হাতিতে চড়ে ঘুরতাম। এখন হাঁটাহাঁটি করি।

শশী মাস্টার বললেন, হাঁটাইটি করা শরীরের জন্যে ভালো। ভিক্ষুক শ্রেণীর যারা সারাদিন হাঁটার মধ্যে, তারা রোগমুক্ত।

শশাংক পাল বললেন, আমি বর্তমানে ভিক্ষুক শ্রেণীতেই পড়ি, তবে রোগমুক্ত না। নানান রোগ শরীরে স্থায়ী হয়েছে। ভালো কথা, আপনি কি মদ্যপান করেন?

না।

শশাংক পাল বললেন, মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে ভালো হতো। আপনার সঙ্গে মদ্যপান করতাম। একা মদ্যপান করা বড়ই কষ্টের।

শশী মাস্টার বললেন, আপনি বোতল নিয়ে আমার এখানে চলে আসবেন। আপনি বোতল নামাবেন আমি ব্যাঞ্জো বাজাব। কলের গানের গানও শুনতে পারেন। আমার একটা কলের গানও আছে।

আপনার কলের গানের কথা শুনেছি। কলের গানের গান আমি পছন্দ করি না। যে গানে গায়ককে দেখা যায় না সেই গান মূল্যহীন। আপনার চামড়ার বাক্সে কি ওষুধ? লিভারের ব্যথার কোনো ওষুধ যদি থাকে দিন। খেয়ে দেখি। আমি আবার ওষুধ খেতে খুব পছন্দ করি। যে-কোনো ওষুধ আগ্রহ করে খাই।

বৈশাখ মাসের এক রাতের কথা। আকাশে নবমীর চাঁদ উঠেছে। শশী মাস্টারের টিনের চালে চাঁদের আলো পড়েছে। টিনের চাল ঝলমল করছে। বনভূমির ঝাঁকড়া সব গাছ মাথায় জোছনা মেখে দুলছে। সৃষ্টি হয়েছে অলৌকিক এক পরিবেশ। শশী মাস্টার কলের গান ছেড়ে জোছনা দেখতে ঘরের বার হয়ে থমকে দাঁড়ালেন। জামঘাছের নিচে টুকটুকে লালশাড়ি পরে এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে।

শশী ভট্টাচার্যের হঠাৎ মনে হলো, এ কোনো মানবী না। নিশ্চয়ই স্বর্গের উর্বশীদের কেউ। কিংবা দেবী স্বরস্বতী স্বয়ং মর্তভূমে নেমে এসেছেন। শশী ভট্টাচার্য বললেন, কে?

তরুণী চমকে উঠল। কিন্তু জবাব দিল না। ছুটে পালিয়েও গেল না।

শশী ভট্টাচার্য বললেন, আপনি কে? এখানে কী করেন?

তরুণী নিচু গলায় বলল, গান শুন।

আপনি কি এই অঞ্চলের?

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী ভট্টাচার্য বললেন, কলের গানে গান হচ্ছে। চোঙের ভেতর দিয়ে গান আসে। একটা যন্ত্র। হাত দিয়ে দম দিতে হয়। আপনি কি যন্ত্রটা দেখবেন?

না।

আপনি কি প্রথম গান শুনতে এসেছেন? নাকি আগেও এসেছেন?

আগেও আসছি।

তরুণী চারটা আঙুল দেখাল।

শশী মাস্টার বললেন, গান শুনতে ভালো লাগছে?

হঁ।

আরেকটা থাল দিব!

থাল কী?

গোল থালের মতো জিনিস। যেখানে গান বাঁধা থাকে।

তরুণী বলল, গান কি দই যে বাঁধা থাকবে?

একটা থাল এনে আপনাকে দেখাই? থালটা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে হ্যান্ডল চাপলেই থাল থেকে গান হয়।

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী মাস্টার বললেন, আপনার নাম কী?

নাম বলব না।

বলতে না চাইলে বলবেন না। আপনি দাঁড়ান, আমি থাল এনে দেখাচ্ছি।

তরুণী বলল, আচ্ছা।

শশী মাস্টার রেকর্ড নিয়ে এসে তরুণীকে দেখতে পেলেন না। জামগাছের নিচে কেউ নেই। আশেপাশেও নেই। কোনো এক বিচিত্র কারণে তার সারারাত ঘুম হলো না। তিনি গভীররাত্রে ভায়েরি খুলে লিখলেন—

I saw an Indian lady at the dead of night. Her
captivating beauty was all engulfing. For a
moment I lost all my senses, I felt like bowing
down at her feet.

শ্রাবণ মাস। হাওরে পানি এসেছে। নদীনালা ফুলে ফেঁপে উঠছে। ধনু শেখ তাঁর একতলা লঞ্চ বিক্রি করে দোতলা লঞ্চ কিনেছেন। এই লঞ্চের প্রধান বিশেষত্ব তার হর্ন। ঘাটে ভিড়েই এমন বিকট শব্দে 'ভেঁ' দেয় যে বাজারের লোকজন চমকে উঠে। লঞ্চের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হিন্দু মুসলিমের আলাদা আসন। হিন্দুরা দোতলায়। মুসলমানরা একতলায়। কোনো মুসলমান দোতলায় উঠতে পারবে

না। দোতলায় ভাতের হোটেল আছে। ব্রাহ্মণ বাবুটির হাতে হোটেল। ছয় আনায় অতি উত্তম ব্যবস্থা। পেটচুক্তি ভাত। সবজি, ডাল, ছোট মাছের চচ্চড়ি। খাওয়ার শেষে একবাটি মিষ্টি দই।

মুসলমানদের জন্যে আলাদা হোটেল নেই। যারা খেতে চায় দোতলার খাবার নিচে চলে আসে। তবে মুসলমানরা সাধারণত কিছু খায় না। তাদের এত পয়সাকড়ি নেই।

দোতলা লঞ্চ চালুর দিনও ধনু শেখ গেল নিবারণ চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর আশীর্বাদ নিতে।

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন, দোতলা লঞ্চ কিনেছ খবর পাইছি। অল্পদিনে ভালো দেখাইলা।

ধনু শেখ বিনীত গলায় বলল, আপনার আশীর্বাদ। আপনার আশীর্বাদ বিনা এই কাজ সম্ভব ছিল না।

লঞ্চের নাম নাকি দিছ— জয় মা কালী সার্ভিস ?

জে কর্তা।

তুমি মুসলমান হইয়া লঞ্চের নাম দিলা জয় মা কালী ?

ধনু শেখ বলল, বাতাস বুইজ্যা পাল তুলছি। হিন্দু যাত্রী বেশি। সেই কারণে হিন্দু নাম।

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন, মুসলমান যাত্রী যদি বেশি হওয়া শুরু করে তখন কি নাম পাল্টাইবা ?

ধনু শেখ হাসিমুখে বললেন, অবশ্যই। তখন নাম হইব ‘মা ফাতেমা সার্ভিস’।

মা ফাতেমাটা কে ?

আমাদের নবিজির কন্যা।

ভালো। ভালো। খুব ভালো।

আমার অনেক দিনের ইচ্ছা আপনেনে লঞ্চ করে সোহাগগঞ্জ বাজারে নিয়া যাব। একটু ইজ্জত করব।

নিবারণ চক্রবর্তী বিরক্ত গলায় বললেন, ইজ্জত আমার যথেষ্টই আছে। তোমার ইজ্জতের প্রয়োজন নাই।

ধনু শেখ বলল, অবশ্যই অবশ্যই।

এই ঘটনার দু'দিন পরই নিবারণ চক্রবর্তীর দোতলা লঞ্চ সোহাগগঞ্জে অচল হয়ে পড়ে গেল। ইঞ্জিনে যে ডিজেল দেয়া হয়েছিল সেখানে নাকি পানি মেশানো ছিল। ডিজেল কেনা হয়েছিল ধনু শেখের দোকান থেকে। সে ডিজেল এবং কেরোসিনের ডিলারশিপ পেয়েছে। তার কাছ থেকে ডিজেল না কিনে উপায় নেই।

শশী মাস্টার ভোরবেলা ঘর ছেড়ে বের হন। মাধাই খালে একঘণ্টা সাঁতার কাটেন। ভেজা কাপড়েই যান স্কুলে। ভেজা কাপড় গায়ে শুকালে স্বাস্থ্য ভালো থাকে এই যুক্তিতে ভেজা কাপড় গায়ে শুকান। স্কুলের ছাত্র পড়ানো শেষ করে, জমিদারির কাগজপত্র নিয়ে বসেন। দুপুরে হরিচরণের সঙ্গে ফলাহার করেন। হরিচরণের সঙ্গে টুকটাক কিছু কথাবার্তা হয়। সবই ধর্মবিষয়ক। ঈশ্বরের স্বরূপ কী? উপনিষদ বলছে— জগত মায়া। মায়ার অর্থ কী? জগৎ যদি মায়া হয় তাহলে কি প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতাও মায়া? শশী মাস্টারের নিজের বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বরাবরই সন্ধ্যা হয়। নিত্যদিনের এই রুটিনে একদিন ব্যতিক্রম হলো। হঠাৎ জ্বর এসে যাওয়ায় স্কুল ছুটি দিয়ে বাড়ি ফিরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি তাঁর ঘরে। কলের গানের সামনে বসে আছে। পেতলের চোঙের ভেতর চোখ রেখে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। শশী মাস্টারকে দেখে তরুণী ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শশী মাস্টার নিজের বিষয় গোপন রেখে বললেন, ঐ রাতে আপনাকে দেখাবার জন্যে থাল এনে দেখি আপনি নাই। চলে গেলেন কেন?

তরুণী জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল।

শশী মাস্টার বললেন, কলের গান কীভাবে বাজে দেখাব?

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশী মাস্টার বললেন, আপনি কি আমার বাড়িতে এর আগেও ঢুকেছেন।

তরুণী হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে তিনটা আঙুল উচিয়ে দেখাল। সে তিনবার ঢুকেছে।

কলের গান দেখার জন্যে?

হঁ।

আপনার নাম জানতে পারি? আজ কি আপনি আপনার নামটা বলবেন?

জুলেখা।

মুসলমান ?

হঁ।

গান খুব পছন্দ করেন ?

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আপনি নিজে একটা বাজনা বাজান আমি দেখছি। বেঞ্জো।

হ্যাঁ, ব্যাঞ্জো।

আপনার বাজনা ভালো না। তাল কাটে।

আপনি কি গান গাইতে পারেন ?

হঁ।

আমি কি আপনার একটা গান শুনতে পারি ?

না। কলের গানটা বাজান। আমি দেখি।

শশী মাস্টার কলের গান চালু করলেন। মীরার ভজন হচ্ছে। শশী মাস্টার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন— গান শুনতে শুনতে এই অস্বাভাবিক রূপবতী মেয়েটি চোখের পানি ফেলছে।

শশী মাস্টার বললেন, কলের গানটা আপনি নিয়ে যান। আমি আপনাকে দিলাম। উপহার।

জুলেখা বলল, আপনার জিনিস আমি নিব কী জন্যে ? আপনে আমার কে ? আরেকটা থাল দিব ? অন্য গান।

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

সেই রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে শশী মাস্টার ডায়েরি লিখতে বসলেন— What a shame! I am deeply in love with the muslim lady— মুনিগণ ধ্যান ভেঙে দেয় পয়ে তপস্যার ফল।

অনেক রাতে শশী মাস্টার একটি কবিতাও লিখলেন—

এক জোড়া কালো আঁখি এত মূল্য তারি!

নিতান্ত পাগল ছাড়া কে করে প্রত্যয় ?

জগতের যত রত্ন লাজে মানে হারি—

বিনিময়ে দিতে পারি, যা কিছু সঞ্চয়!

অনেকদিন পর হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি 'ইসলামি গান' শিরোনামে রূপবতী জুলেখার একটি রেকর্ড প্রকাশ করে। সেখানে তার নাম লেখা হয় চান বিবি। গানের প্রথম কলি— 'কে যাবি কে যাবি বল সোনার মদিনায়।' সেই গল্প যথাসময়ে বলা হবে। এই ফাঁকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাটা বলে নেই। সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং রানী মেরী বেড়াতে এসেছেন ভারতবর্ষে (ডিসেম্বর, ১৯১১)। তাঁদের সম্মানে দিল্লিতে এক মহা দরবার অনুষ্ঠিত হলো। সেই দরবারে সম্রাট হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করলেন। মুসলমানরা মর্মাহত। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্যে যে মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ইংরেজের প্রিয়পাত্র হয়েও তিনি বঙ্গভঙ্গের কঠিন সমালোচনা করলেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন আইনজীবী মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহম্মদ আলি, মাওলানা জাফর আলি খান। রাজনীতির আসরে এই সময় যুক্ত হয়েছেন বরিশালের চাখার থেকে আসা এক তরুণ। তাঁর নাম এ কে ফজলুল হক।



কার্তিক মাসের শেষ ।

উত্তরের গারো পাহাড় থেকে শীতের হিমেল হাওয়া উড়ে আসতে শুরু করেছে । এবারের লক্ষণ ভালো না । মনে হয় ভালো শীত পড়বে । দু'বছর পরপর হাড় কাঁপানো শীত পড়ে । গত দু'বছর তেমন শীত পড়ে নি ।

হরিচরণ চাদর গায়ে পুকুরপাড়ে এসে বসেছেন । তাঁর মন বেশ খারাপ । তিনি খবর পেয়েছেন ধনু শেখের দোতলা লঞ্চে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে । ভেদবমি করতে করতে একজন মারা গেছে । বান্ধবপুরে কলেরা এসে ঢুকেছে । গ্রামের পর গ্রাম শূন্য করে দেয়া এই ব্যাধির কাছে মানুষ অসহায় । তিনি মনে মনে বললেন, দয়া কর দয়াময় । যেন দেবী ওলাউঠা লঞ্চে করে বান্ধবপুর না নামেন । তাঁর প্রার্থনার সময় বিস্ময়কর এক ঘটনা ঘটল । তাঁর দিঘিতে একজোড়া শীতের হাঁস নামল । শীতের পাখি নামে হাওরে, মনে হচ্ছে এই প্রথম কোনো দিঘিতে নামল । দিঘিও এমন কিছু বড় দিঘি না । এরা কি মনের ভুলে নেমে পড়েছে ? নাকি কোনো কারণে দলছুট হয়েছে ? দলছুট হবার সম্ভাবনাই বেশি ।

দু'টি হাঁসের একটি পানিতে স্থির হয়ে আছে । অন্যটি একটু পরপর ডুব দিচ্ছে । এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত, ঘটনা কী ?

হরিচরণ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন । দু'টা পাখিই ঘাটের কাছে । ভয় পেয়ে ওদের উড়ে যাওয়া উচিত, তা গেল না । সম্ভবত এরা মানুষ দেখে অভ্যস্ত না । মানুষ যে বিপদজনক প্রাণী এই তথ্য এখনো জানে না । হরিচরণ বললেন, তোদের সমস্যা কী রে ? একটা হাঁস তাঁর দিকে তাকাল । দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এ ক্লান্ত । রোগা শরীর । দুই থেকে আড়াই মাস এরা থাকবে । মোটাতাজা হয়ে দেশে ফিরে যাবে । একটা পাখি তার একজীবনে কতবার আসা যাওয়া করে এই তথ্য কি কেউ জানে ? হরিচরণ ঠিক করে ফেললেন গদিতে পৌঁছেই পাখিবিষয়ক কোনো বইপত্র পাওয়া যায় কি-না জানতে চেয়ে কোলকাতায় চিঠি

লিখবেন। 'মানব বুক হাইস' নামে একটা বইয়ের দোকানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে। তাঁর প্রয়োজনীয় বইপত্র এরাই পাঠায়।

জুলেখা বাটিভর্তি খেজুরের রস নিয়ে এসেছে। নিজেদের গাছের রস। সে জ্বাল দিয়ে ঘন করেছে। অপূর্ব ঘ্রাণ ছেড়েছে। খেজুরের রস খেজুরপাতা দিয়ে জ্বাল না দিলে ভালো ঘ্রাণ হয় না। জুলেখা খেজুরপাতা দিয়েই রস জ্বাল দিয়েছে।

জুলেখা লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, আপনার জন্যে খেজুরের রস আনছি।

ভালো করেছ। রস ভালো হয়েছে। সুঘ্রাণ ছেড়েছে। তাকিয়ে দেখ দিঘিতে দু'টা হাঁস নেমেছে।

ও আল্লা। কী আচানক! আরো কি নামবে?

নামতে পারে। সব পশুপাখি নিজেদের ভেতর যোগাযোগ রাখে। এই দু'টা পাখি হয়তো অন্যদের খবর দিবে। আমি ঠিক করেছি আজ আর গদিতে যাব না। ঘাটে বসে থাকব। দেখি আরো পাখি নামে কি-না।

জুলেখা মুখে আঁচল চাপা দিতে দিতে বলল, বাবা, আপনি আজব মানুষ।

হরিচরণ বললেন, আমরা সবাই আজব মানুষ। তুমি আজব, তোমার ছেলে আজব, তোমার স্বামী আজব। ঈশ্বর নিজে আজব, সেই কারণে তিনি আজব জিনিস তৈরি করতে পছন্দ করেন। রসের বাটিটা দাও, এক চুমুকে খেয়ে ফেলি।

জুলেখা বিস্মিত হয়ে বলল, এতটা রস একসঙ্গে খাবেন?

কোনো অসুবিধা নাই, দুপুরে ভাত খাব না।

হরিচরণ তৃপ্তি করে বাটিভর্তি ঘন খেজুরের রস শেষ করলেন। পুকুরের পানিতে ঠোঁট ধুতে ধুতে বললেন, মা, তুমি নানান সময়ে নানান ভাবে আমার সেবা করছ। তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই। কী পেলে তুমি খুশি হবে?

জুলেখা জবাব দিল না। যদিও তার ইচ্ছা করছে বলে, আমাকে একটা কলের গান কিনে দেন। এই যন্ত্রটার জন্যে আমি আমার জীবন দিয়ে দিতে রাজি। কী অদ্ভুত জিনিস! পিতলের এক চোঙ। চোঙের ভেতর দিয়ে আসে কী সুন্দর গান। একটা গান ইচ্ছা করলে দশবার শোনা যাবে। সুরে ভুল হবে না। তালে ভুল হবে না। বাজনায় ভুল হবে না। কী আজব যন্ত্র! ইশ সে যদি তার বাপজানকে যন্ত্রটা দেখাতে পারত!

হরিচরণ বললেন, তোমার মনের মধ্যে কিছু আছে, বলে ফেল।

জুলেখা বলল, মনের মধ্যে কিছু নাই।

বলতে বলতে সে হরিচরণের পাশে বসল। হরিচরণ বললেন, এই হাঁসের একটা নাম আছে, সেটা জানো?

জুলেখা বলল, না।

এর নাম 'দেশান্তরী পাখি'। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়, এই জন্যেই দেশান্তরী।

জুলেখার মনে হলো— কী সুন্দর নাম! দেশান্তরী। পাখিদের মতো দেশান্তরী মানুষও তো আছে যাদের কাজ এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া। তার নিজের বাবাও তো দেশান্তরী। জুলেখার ইচ্ছা করছে দেশান্তরী দিয়ে একটা গান লেখে। প্রথম লাইন—

দেশান্তরী বান্ধই গো, কোন দেশেতে যাও ?

পরের লাইনটা মাথায় আসছে না। সে যদি লেখাপড়া জানত এই লাইনটা লিখে রাখত। লেখাপড়া শেখা খুব কি জটিল ? সে কোরান মজিদ পাঠ করতে পারে। লিখতে পারে না।

হরিচরণ বললেন, জুলেখা, তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও ? বলতে চাইলে বলো।

জুলেখা মাথা নিচু করে বলল, আমি বাংলা লেখা বাংলা পড়া শিখতে চাই।

হরিচরণ বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকা তরুণীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি নিজে তোমাকে শেখাব। তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাখবে। মুসলমানদের মধ্যে এই বিষয়টা দেখেছি। তারা স্ত্রীদের লেখাপড়া পছন্দ করে না।

জুলেখা বলল, স্ত্রী লেখাপড়া শিখলে স্বামীর হায়াত কমে, এইজন্যে পছন্দ করে না।

এইসব তো ভুল কথা।

সবাই জানে ভুল কথা, তারপরও ভুল কথাই মানে।

তুমি সুলেমানকে আমার কাছে পাঠাবা, আমি তারে বুঝায়া বলব।

সে দেশে নাই। মৈমনসিং গেছে কামে। ফিরতে একমাস লাগব। আমি কি এর মধ্যে শিখতে পারব না ?

হরিচরণ কিছুক্ষণ জুলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, অবশ্যই পারবা। বলো— অ।

জুলেখা বলল, অ।

এখন বলো, আ।

জুলেখা বলল, আ।

এক টুকরা কয়লা আন। আমি অক্ষর দুইটা লিখব। আজ সন্ধ্যায় তোমার জন্যে বাল্যশিক্ষা কিনে আনব।

জুলেখা এক টুকরো কয়লা এনেছে। শ্বেতপাথরে সেই কয়লার দাগ বসছে না। হরিচরণ উঠে দাঁড়ালেন। ঘাটে বসে থাকার পরিকল্পনা তিনি বাদ দিয়েছেন। তিনি বাজারে যাবেন। মেয়েটার জন্যে স্লেট পেন্সিল কিনবেন। বাল্যশিক্ষা কিনবেন।

হরিচরণ ঘাট থেকে যাবার কিছুক্ষণ পরই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। দিঘিতে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস নামতে শুরু করল। দেখতে দেখতে দিঘি হাঁসে পূর্ণ হলো। অদ্ভুত দৃশ্য। যেন দিঘিতে হাঁসের সর পড়েছে। সেই সর উঠানামা করছে। হাঁসদের কারণে দিঘি থেকে হোঁ হোঁ হোঁ জাতীয় গম্ভীর ধ্বনি উঠছে।

একই সময় বাবু মনিশংকরের বাড়ি থেকে অসময়ে শাঁখের শব্দ হতে লাগল। মনিশংকরের এক জেঠির ভেদ বমি শুরু হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে দেবী ওলাউঠার দয়া। দেবীকে দূর করার জন্যেই শঙ্খধ্বনি। অদ্ভুত শব্দ আসছে শঙ্খ থেকেও। ভোঁ ভোঁ ভোঁ। যেন দূর থেকে লঞ্চ ভোঁ দিচ্ছে। শঙ্খের শব্দের সঙ্গে হাঁসের শব্দ মিলে একাকার হয়ে গেল।

সুলেমানের স্ত্রী জুলেখা আয়োজন করে পায়ে আলতা দিচ্ছে। সে বসেছে বেতের মোড়ায়। তার পা জলচৌকিতে রাখা। পাটকাঠির মাথা কলমের নিচের মতো কেটে তুলি বানানো হয়েছে। জহির মুঞ্চ চোখে মা'র পায়ের শিল্পকর্ম দেখছে। একটু দূরে ছোট ধামাভর্তি মুড়ি এবং খেজুর গুড় নিয়ে বসেছে সুলেমান। সে তিন দিন হলো ফিরেছে। স্ত্রীর জন্যে কচুয়া রঙের একটা শাড়ি এনেছে। এই বিষয়ে স্ত্রীর কোনো উৎসাহ নেই দেখে আহত হয়েছে। জুলেখা সেই শাড়ির ভাজ এখনো খুলে নি। নতুন শাড়ি পেয়ে কদমবুসি করা প্রয়োজন, তাও করে নি। তার পুত্র জহির মুড়ি খাওয়া বাদ দিয়ে মায়ের সাজ দেখছে, এতেও সুলেমান মহা বিরক্ত। আজ জুম্মাবার। জুম্মাবারে এত সাজসজ্জা কী?

সুলেমান জহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ পুলা, মুড়ি খাইয়া যা।

জহির মা'র দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই গম্ভীর গলায় বলল, না।

জুলেখা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, পাও আলতা দিতে ইচ্ছা করে?

জহির সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার ছোট পা জলচৌকিতে তুলে দিল। জুলেখা ছেলের পায়ে লাল টুকটুকে একটা মাছ ঐঁকে দিল। জহিরের মুখভর্তি হাসি।

রাগে সুলেমানের শরীর জ্বলে যাচ্ছে। ছেলেকে নিয়ে সে জুম্মার নামাজ পড়তে যাবে, এর মধ্যে পায়ে আলতা! তার উচিত ছেলের গালে শক্ত করে একটা চড় দেয়া। এটা সে করতে পারছে না। জহিরের শরীর ভালো না। কালরাতেও জ্বর ছিল। এখনো হয়তো আছে।

সুলেমান বলল, সন্ধ্যাবেলা আলতা নিয়া বসনা। কাজটা উচিত হয়েছে।

জুলেখা বলল, সন্ধ্যাবেলা আলতা দেওয়া যাবে না এমন কথা কি হাদিস কোরানে আছে?

এইটা কেমন কথা? তোমার উপরে কি জিন ভূতের আছর হইছে? জিন ভূতের আছর হইলে মেয়েছেলে স্বামীর মুখের উপরে ফড়ফড় করে। জঙ্গলায় ঘুরে। সময় অসময়ে গীত ধরে।

জুলেখা জবাব না দিয়ে ছেলের অন্যপায়ে আরেকটা মাছ আঁকছে। সুলেমান বলল, পুরুষ মাইনষের পাও আলতা দিতাছ?

জুলেখা বলল, জহির পুলাপান। পুলাপানের পায়ে আলতা দিলে দোষ হয় না।

এই কথা কোন বুজুর্গ আলেম তোমারে বলেছে?

জুলেখা জবাব দিল না। স্বামীর বেশিরভাগ প্রশ্নেরই সে জবাব দেয় না।

সুলেমান বলল, জহিরের নিয়া জুম্মার নামাজ পড়তে যাব। তখন যদি পাও রঙ থাকে—

জুলেখা ফিক করে হেসে ফেলল।

সুলেমান বলল, হাসলা যে? কী কারণে হাসলা?

জুলেখা বলল, কী কারণে হাসছি আপনাদের বলব না।

জুলেখা হাসছে কারণ সে তার স্বামীকে ভালো ফাঁকি দিয়েছে। তাকে না জানিয়ে লেখাপড়া শিখে ফেলেছে। যে-কোনো লেখা সে এখন পড়তে পারে।

সুলেমান বলল, তুই অবশ্যি বলবি।

তুই তোকারি কইরেন না।

সুলেমান কঠিন গলায় বলল, আগে বল তুই হাসলি কী জন্যে? হাসির কথা কী হইছে?

জুলেখা কিছুই বলল না, নিজের মনে পায়ে আলতা দিতে লাগল। সুলেমান মুড়ি খাওয়া বন্ধ করে উঠে এলো। প্রথমে ভেবেছিল স্ত্রীর গালে কষে থাপ্পড় দিবে। বেয়াদব স্ত্রীকে শাসন করার অধিকার সব স্বামীর আছে। মাওলানা সাহেব

বলেছেন আল্লাহপাক পুরুষ মানুষের এই অধিকার দিয়েছেন। কারণ পুরুষের অবস্থান নারীর উপরে। তবে শাসনের সময় খেয়াল রাখতে হবে স্ত্রীর মুখমণ্ডলে যেন মারের চিহ্ন না থাকে। সুলেমান থাপ্পড় উঠিয়ে এগিয়ে এলেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। থাপ্পড় দেবার বদলে আলতার শিশি উঠানে ছুড়ে ফেলে দিল।

জুলেখার একপায়ে আলতা দেয়া হয়েছে। অন্য পা খালি। আবার কবে আলতা কেনা হবে, কবে পায়ে দেয়া হবে কে জানে! বেদেবহর নৌকা করে এখনো আসে নি। তারা চলে এলে সমস্যা নেই। গাইন বেটিরা ঝুড়ি ভর্তি করে কাচের চুড়ি, আলতা, গন্ধতেল নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে। বাহারি জিনিস বেচবে। একইসঙ্গে কাইক্যা মাছের কাটা দিয়ে শরীরের বদ রক্ত দূর করবে। গাইন বেটিদের কাছ থেকে শখের জিনিসপত্র কেনার জন্যে এবং বদ রক্ত বের করার জন্যে সব মেয়েই টাকা-পয়সা জমিয়ে রাখে। জুলেখারও জমা টাকা আছে।

সুলেমান বলল, কিম ধইরা বইসা থাকবা না। ছেলের পাওয়ার আলতা ঘইসা তোল। আইজ জুম্বাবার। নামাজে যাব। ছেলেরে ঘাটে নিয়ে যাও। রিঠা গাছের পাতা দিয়া ডলা দাও।

জুলেখা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে ছেলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছেলের দুই পায়ে দুই মাছ। কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে মাছ দু'টা! এই সুন্দর দুটা মাছ তুলে ফেলতে হবে? কাজটা বড়ই কঠিন। সুন্দর নষ্ট করা যায় না। সুন্দর নষ্ট করলে পাপ হয়। এই কথা তার বাপজান তাকে বলেছিলেন।

পুকুরঘাটে পা ডুবিয়ে জহির বসেছে। জুলেখা তার সামনে। জুলেখার হাতে গায়ে মাখা গন্ধ সাবান। এই সাবান গত বছর গাইনবেটিদের কাছ থেকে কেনা, গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা। সুলেমান এত দামের সাবান দেখতে পেলে রাগবে।

জহির বলল, মা গীত কর।

কোন গীত?

পাও ধুয়ানি গীত।

জুলেখা সঙ্গে সঙ্গে গাইল—

সোনার পায়ে সোনার মাছ

ঝিলমিল ঝিলমিল করে

এই মাছেরে দিয়ে আসব

দক্ষিণ সায়েরে।

গানের কথাগুলি জুলেখা এখনই তৈরি করল। তার এত ভালো লাগল। তার বাপজানের গুণ কি তার মধ্যে আছে? কোনোদিন কি সে তার বাপজানের মতো মুখে মুখে গান বাঁধতে পারবে?

মাওলানা ইদরিস খুতবা পাঠ শেষ করলেন। মুসুল্লিদের দিকে তাকালেন। মাত্র নয়জন। তাঁর হিসেবে আরো বেশি হবার কথা। কাঠমিস্ত্রি সুলেমান তার পুত্রকে নিয়ে এসেছে। এটা ভালো। সুলেমান সবসময় আসে না। মাঝেমধ্যে একা আসে, ছেলেকে আনে না। শিশুদের গুরু থেকেই ধর্মকর্মে আগ্রহী করা পিতা-মাতার কর্তব্য। যে পিতা-মাতা এই কর্তব্যে অবহেলা করবেন রোজ হাশরে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির বিধান আছে।

মাওলানা বললেন, আপনাদের জন্যে সামান্য শিনির ব্যবস্থা আছে।

মাওলানা শিনির হাঁড়ি এবং চামচ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুসুল্লিরা কলাপাতা হাতে নিলেন। নবিজি মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। নবিজির পছন্দের জিনিস করা তাঁর উদ্দেশ্যের জন্যে সোয়াবের কাজ।

শিনি মাওলানা নিজেই তাঁর বাড়িতে প্রস্তুত করেছেন। দুধ, আলোচাল, গুড়, সঙ্গে কিছু কিশমিশ এবং তেজপাতা। খাঁটি দুধ। দীর্ঘসময় জ্বাল হয়ে অপূর্ব স্বাদু বস্তু তৈরি হয়েছে। সবাই আগ্রহ করে খাচ্ছে। মাওলানা দ্বিতীয়বার শিনি দিতে দিতে বললেন, আল্লাহপাক আমার উপর বড় একটা দয়া করেছেন বলেই এই শিনির ব্যবস্থা। আপনারা আমার জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করবেন। সবাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। কেউ জানতে চাইল না— বড় দয়াটা কী?

মাওলানা নিজেই খোলাসা করলেন। তিনি কোরান মজিদ পুরোটা মুখস্থ করেছেন। এখন তাঁকে কোনো আলেম হাফেজের কাছে যেতে হবে। তাঁকে কোরানমজিদ মুখস্থ শোনাতে হবে। হাফেজ সাহেব যদি বলেন ঠিক আছে, তাহলে নামের গুরুতে তিনি হাফেজ টাইটেল ব্যবহার করবেন। তাঁর টাইটেল হবে হাফেজ মাওলানা ইদরিস।

জীবনের একটা আকাজক্ষাই তখন অপূর্ণ থাকবে— নবিজির মাজার জেয়ারত। হজ্ব তাঁর জন্যে ফরজ না। তিনি বিত্তহীন সামান্য মাওলানা। হজে তাঁর না গেলেও হবে, কিন্তু নবিজির মাজার জেয়ারত করা তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। তিনি নবিজির মাজারের কাছে যাবেন, দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে বলবেন, হে জগতের আলো, পেয়ারা নবি! আসসালামু আলায়কুম। আমি আল্লাহপাকের

নাদান বান্দা গুনাগার ইদরিস। যে পাক কোরান আপনার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছে সেই পাক কোরান আমি মুখস্ত করেছি। আমার দিলের একটা খায়েশ আপনাদের কোরান মজিদ আবৃত্তি করে শোনাব। যদি অনুমতি দেন।

জুমার নামাজ শেষ করে মাওলানা নিজের ঘরে ফিরেছেন। আজকের দিনটি স্বরণে যেন থাকে এইজন্যে বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা লিচুগাছের চারা লাগালেন। গাছ বড় হবে। একসময় ফল আসবে। নবিজি গাছ রোপণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। একবার এক হত্যাঅপরাধীর মৃত্যুদণ্ড রদ করে গাছ রোপণের দণ্ড দিয়েছিলেন। তার শাস্তি হয়েছিল সে একশ' খেজুর গাছ লাগাবে এবং প্রতিটি গাছকে সেবায়ত্নে ফলবতী করবে।

এই অঞ্চলে লিচুগাছ নেই। হিন্দুবাড়িতেও নেই, মুসলমান বাড়িতেও নেই। লোকজ বিশ্বাস— বসতবাড়ির আশেপাশে লিচুগাছ লাগানো যাবে না। লিচুগাছ মানুষকে নির্বংশ করে।

মাওলানার চালাঘরটা সুন্দর। উঠানে একটা পাতা পড়ে নেই। দু'বেলা এই উঠান মাওলানা নিজে ঝাট দেন। সপ্তাহে একদিন গোবর-মাটির মিশ্রণ লেপে দেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর ইসলাম ধর্মে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

লিচুগাছ লাগানোর পরপরই মাওলানা অনুভব করলেন তাঁর জ্বর আসছে। শরীর কেমন যেন করছে। গা গুলাচ্ছে। বমি আসছে। আজকের দিনের অতিরিক্ত উত্তেজনায় কি এমন হচ্ছে? মাওলানা ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। দীর্ঘ কয়েক বছর পর আজ প্রথম তাঁর আসরের নামাজ কাজা হলো। মাগরেবের নামাজ কাজা হলো। বমি করে তিনি ঘর নষ্ট করলেন, নিজের পায়জামা-পাঞ্জাবি নষ্ট করলেন।

একজন কোরানে হাফেজ অপবিত্র থাকতে পারেন না। তাঁকে সবসময় অজুর মধ্যে থাকতে হবে। কারণ তাঁর শরীরে পবিত্র কোরান মজিদ। তিনি জ্বর গায়েই গোসল করলেন। ধোয়া পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলেন।

সুলেমানের বাড়ি অন্ধকার। সন্ধ্যার পরপর বাড়িতে আলো দিতে হয়। সন্ধ্যায় আলো না দিলে বসতবাড়িতে ভূত-প্রেত ঢোকে। খারাপ বাতাস কপাটের পেছনে স্থায়ী হয়ে যায়। সুলেমানের স্ত্রী জুলেখা বাড়ির পেছনের উঠানের জলচৌকিতে বসে আছে। তার হাতের কাছে কুপি, সে এখনো কুপি ধরায় নি। সন্ধ্যা থেকে কাঁদছিল, এখন কান্না বন্ধ। গালে পানির দাগ বসে গেছে। আজ

তাকে কঠিন শাস্তির ভেতর দিয়ে যেতে হবে তা সে জানে। শাস্তি কী হবে জানে না বলেই অশান্তি।

আজ সে অপরাধও করেছে গুরুতর। দুপুরে যখন ঘরে কেউ ছিল না (সুলেমান গেছে হাটে। তার পুত্র গেছে হরিচরণের বাড়িতে হাতি দেখতে।) তখন সে বাড়ির পেছনের পুকুরে গোসল করতে গেল। পুকুর ঠিক না, বড়সড় ডোবা। বর্ষায় পানি হয়। সুলেমান কাঠের কয়েকটা গুড়ি ফেলে ঘাটের মতো করে দিয়েছে। ডোবার চারদিকেই ঘন জঙ্গল। আক্ৰ রক্ষার আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। জুলেখা গোসল করতে ঘাটে গেল। পানিতে নামল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে। গায়ে কোনো কাপড় ছাড়া পানিতে ভেসে থাকার অন্যরকম আনন্দ। কেউ তো আর দেখছে না।

জুলেখা অতি রূপবতীদের একজন। আজ তাকে আরো সুন্দর লাগছে। শঙ্খর মতো শাদা গা থেকে অলো ঠিকরে আসছে। খাড়া নাক আজ অনেক তীক্ষ্ণ লাগছে। বড় বড় চোখ। ছায়াদায়িনী দীর্ঘ পল্লব যেন আরো গাঢ় হয়েছে। পান না খেয়েও ঠোঁট লাল। মাথার চুল ঈষৎ পিঙ্গল। সেই চুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত।

বাড়ির সীমানার বাইরে যাওয়া জুলেখার নিষেধ। বাপের দেশে নাইয়ের যাওয়াও নিষেধ। বিয়ের পর সে একবার মাত্র তিনদিনের জন্যে বাপের দেশে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। যেতে হয়েছে বোরকা পরে। সুলেমান কঠিন নিষেধ করে দিয়েছিল, পুরুষ আত্মীয়ের সামনেও বোরকার মুখ খোলা যাবে না। বাবা এবং ভাইদের সামনে খোলা যেত। জুলেখার বাবা কোথায় কেউ জানে না। ভাই যারা তারা সৎ মায়ের গর্ভের, কাজেই বোরকার মুখ খোলার প্রয়োজন পড়ছে না।

হাট থেকে সুলেমান ফেরে সন্ধ্যায়। সেদিন কোনো কারণে বা ইচ্ছা করেই সে হাটে না গিয়ে দুপুরের দিকে বাড়ি ফিরল। বসত বাড়ির সদর দরজা দিয়ে সাড়াশব্দ করে না ঢুকে ঢুকল বাড়ির পেছন দিয়ে। চুপি চুপি ঘাটলার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কী দেখছে সে! জুলেখা সাঁতার কাটছে। চোখ বন্ধ করে চিৎ সাঁতার দিচ্ছে। তার নগ্ন শরীরের পুরোটাই পানির উপর ভাসছে। গুনগুন শব্দও আসছে। গান করছে না-কি! সুলেমান চাপা গর্জন করল— এই বান্দি! তুই করস কী?

মুহূর্তের মধ্যে জুলেখা পানিতে ডুব দিল। মানবী জলকন্যা না, দীর্ঘ সময় সে জলে ডুবে থাকতে পারে না। জুলেখাকে ভেসে উঠতে হলো। সে অতি দ্রুত গায়ে কাপড় জড়াল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে সে তাকাল সুলেমানের দিকে।

সুলেমান বলল, কারে শরীর দেখানোর জন্যে নেংটা হইছস ?

জুলেখা বলল, কাউরে দেখানোর জন্যে না।

সুলেমান বলল, মিথ্যা বইল্যা আইজ পার পাবি না। অবশ্যই কেউ আছে।
তারে খবর দেয়া আছে। সে জংলার কোনো চিপায় আছে। তার নাম বল।

এমন কেউ নাই।

মুরগি যেমন জবেহ করে তোর গলা সেই মতো কাটব। নাম বল। তুই তো
কারণে অকারণে ঐ হিন্দুর বাড়িতে বইসা থাকস। তার ঘর ঠিক করস। উঠান
ঝাড় দেস। তার সাথে তোর কী ?

উনারে আমি বাবা ডেকেছি। উনার বিষয়ে কিছু বলবেন না।

মালাউন হইছে তোর বাবা ? আমারে বাবা শিখাস ?

জুলেখা চুপ করে গেল। রাগে উন্মাদ একজন মানুষের সঙ্গে যুক্তি তর্ক
করা অর্থহীন। সুলেমান দা হাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাটে বসে রইল। দু'জন
মুখোমুখি বসা। জহির এখনো ফিরে নি। এটা ভালো। হরিবাবুর বাড়িতে
আরো কিছুক্ষণ থাকুক। হাতি দেখবে। খেলবে। রাতে তাকে নিয়ে আসবে।
সবচে' ভালো হয় রাতে ছেলে ঐ বাড়িতে যদি থেকে যায়। এখানে কী ঘটনা
ঘটবে কিছুই বলা যায় না। খুন খারাবিও হয়ে যেতে পারে। পুলাপানদের
এইসব দেখা ঠিক না।

সুলেমান ফিরল বিছুটি পাতার বড় একটা ঝাড় হাতে নিয়ে। তার মুখভঙ্গি
শান্ত। রাগের প্রথম ঝড় পার হয়েছে। প্রথম ঝড়ের পর দ্বিতীয় ঝড় আসতে
কিছু সময় নেয়। সুলেমান কুপি জ্বালিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, নেংটা হইতে
তোর মজা লাগে। এখন নেংটা হ।

জুলেখা বলল, না।

সুলেমান বলল, কোনো কথা না। যা করতে বললাম করবি। শাড়ি খোল।
না।

আবার বলে না! এক্ষণ খুলবি। তোর নেংটা হওনের স্বাদ জনোর মতো
মিটায়ে দিব। শাড়ি খোল।

জুলেখা শাড়ি খুলল। সুলেমান বিছুটি পাতার বাড়ি শুরু করল। দু'হাতে মুখ
ঢেকে জুলেখা পশুর মতো গোঙাতে শুরু করল। তার শরীর ফুলে গেল সঙ্গে
সঙ্গে। জায়গায় জায়গায় কেটে রক্ত বের হচ্ছে। ফর্সা শরীর হয়েছে ঘন লাল।
বিষাক্ত বিছুটি পাতার জ্বলুনিতে জায়গায় জায়গায় চামড়া জমে গেছে। জুলেখার
মুখ দিয়ে লাল পড়ছে। দু'টা চোখই টকটকে লাল।

সুলেমান বিছুটি পাতার ঝাড় ফেলে দিয়ে বলল, শান্তি শেষ, এখন শাড়ি পর।

জুলেখা পশুর মতো গোঙাতে গোঙাতে বলল, শাড়ি পরব না। এই বাড়িতে আমি যতদিন থাকব নেংটা থাকব।

সুলেমান বলল, কী বললি?

জুলেখা বলল, কী বলেছি আপনি শুনেছেন। আমি বাকি জীবন এই বাড়িতে নেংটা ঘুরাফেরা করব।

সুলেমান বলল, জহিরেরে আনতে যাইতেছি। কাপড় পর। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা কইরা দেখ— আমার জায়গায় অন্য কোনো পুরুষ হইলে শান্তি আরো বেশি হইত।

সুলেমান ছেলেকে নিয়ে রাত নটার দিকে ফিরল। দরজায় খিল দেয়া। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কানোর পর খিল খুলল। জুলেখা কাপড় পরে নি। সে সম্পূর্ণ নগ্ন। এক হাতে কেরোসিনের কুপি নিয়ে সে স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। যেন কিছুই হয় নি।

সুলেমান স্ত্রীর হাত থেকে কুপি নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। এমন দৃশ্য ছেলের দেখা ঠিক না। জহির কাঁদতে শুরু করল।

সুলেমান চাপা গলায় বলল, তুই নেংটা থাকবি?

হঁ।

তোর তো জিনে ধরেছে।

ধরলে ধরেছে।

আমার ঘরে তোর জায়গা নাই।

না থাকলে চইল্যা যাব।

তোর তালাক দিলাম। তালাক। তালাক। তালাক। এখন ঘর থাইকা যাবি। নেংটা অবস্থায় যাবি।

জুলেখা স্বাভাবিক গলায় বলল, আচ্ছা।

মাগুলানা ইদরিসের জ্বর আরো বেড়েছে। শরীর এবং হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। আরেকবার বমি আসছে। দ্বিতীয়বার বিছানা নষ্ট করা কোনো কাজের কথা না। তিনি অনেক কষ্টে হারিকেন হাতে দরজা খুলে বারান্দায় এসে খুঁটি ধরে বসলেন। শরীর উল্টে বমি আসছে, তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। মনে হচ্ছে তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন এবং আজ রাত্রিতেই তাঁর মৃত্যু হবে।

শরীরের এই অবস্থায় তাঁর মনে হলো, অতি রূপবতী এক নগ্ন তরুণী উঠানের কাঁঠাল গাছের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শয়তান তাকে ধাক্কা দেখাতে শুরু করেছে। মৃত্যুর সময় তিনি যাতে আল্লাহখোদার নাম নিতে না পারেন শয়তান সেই ব্যবস্থা করেছে। পরীর মতো এক মেয়ের রূপ ধরে এসেছে।

মাওলানা ইদরিস বললেন, হে আল্লাহপাক, তুমি আমাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা কর। তিনি আয়াতুল কুরসি পাঠ শুরু করলেন। তাঁর দৃষ্টি কাঁঠাল গাছের দিকে। মেয়েটা এখনো আছে। মাওলানা ভীত গলায় বললেন, তুই কে ?

নগ্ন মেয়ে কাঁঠাল গাছের আড়ালে চলে গেল।

মাওলানা বললেন, ইবলিশ দূর হ। তাকে আল্লাহর দোহাই লাগে তুই দূর হ। দূর হ কইলাম।

মেয়েটা দূর হলো না। কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। মাওলানা জ্ঞান হারালেন।

গভীর রাতে তার জ্ঞান ফিরল। তিনি বারান্দাতেই শুয়ে আছেন। তবে তাঁর গায়ে চাদর। মাথার নিচে বালিশ। তারচেয়ে আশ্চর্য কথা, শয়তানরূপী মেয়েটা আছে। হারিকেন হাতে তাঁর পাশেই গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তার গায়ে বিছানার চাদর জড়ানো।

মাওলানা ভীত গলায় বললেন, তুমি কে ?

মেয়েটা জবাব দিল না। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

মাওলানা দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না। কী সুন্দরই না মেয়েটার মুখ! বেহেশতের ছরদের যে বর্ণনা আছে এই মেয়ে সে-রকম। মাওলানা আবারো বললেন, তুমি কে ?

মেয়েটা বলল, আমি জুলেখা।

মাওলানা বিড়বিড় করে বললেন, জুলেখা। জুলেখা। জুলেখা। কোরান মজিদে জুলেখার কথা উল্লেখ না থাকলেও তাঁর স্বামী নবি ইউসুফের কথা অনেকবার বলা হয়েছে।

মেয়েটা বলল, আপনার কলেরা হয়েছে।

মাওলানা বললেন, জুলেখা, পানি খাব।

জুলেখা বলল, কলেরা রোগীকে পানি দেওয়া যায় না। পানি খাইলে রোগ বাড়ে।

মাওলানা বললেন, পানি খাব। জুলেখা পানি খাব।

জুলেখা ঘরে ঢুকে গেল। মাওলানার মনে হলো, শয়তান তাকে নিয়ে যে খেলা দেখাচ্ছিল সেই খেলার অবসান হয়েছে। মেয়েটা ফিরবে না।

মেয়েটা কিন্তু ফিরল। হাতে কাঁসার গ্লাস নিয়ে ফিরল। মাওলানা আবার বমি করতে শুরু করলেন। জুলেখা তাঁকে এসে ধরল। মাওলানা বললেন, তুমি কে গো ?

জুলেখা জবাব দিল না।

বাজারের দিক থেকে কাঁসার ঘণ্টা বাজার শব্দ শুরু হয়েছে। খুব হৈচৈ হচ্ছে। কেউ একজন মারা গেছে কলেরায়। ঘণ্টা বাজিয়ে ওলাউঠা দেবীকে দূরে সরানোর চেষ্টা। দেবী একবার যখন এসেছেন এত সহজে যাবেন না। তিনি এসেছেন মায়ের বাড়ির দেশে।

ওলাউঠা দেবী কোনো সহজ দেবী না। বড়ই কঠিন দেবী। তিনি যখন দেখা দেন অঞ্চলের পর অঞ্চল শেষ করে দেন। শীতলা দেবীর মতো তিনি তাঁর চেহারা দেখান না। তিনি ঘোমটায় মুখ আড়াল করে হাঁটেন। হৈচৈ পছন্দ করেন না। ধূপ ধোনার গন্ধ পছন্দ করেন না। তাঁর সবচেয়ে অপছন্দ নদী। শীতলা দেবী যেমন অনায়াসে নদীর পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলে যান, তিনি তা পারেন না। তাঁকে খেয়ামাঝির সাহায্য নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়।

ওলাদেবীর হাত থেকে বান্ধবপুরের হিন্দুদের রক্ষার জন্যে বটকালীর মন্দিরে কালীপূজা দেয়া হয়েছে। পাঁঠা বলি হয়েছে। মাটির হাড়িতে পশুর রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই রক্ত দিয়ে সবাই ভক্তিভরে কপালে ফোটা দিয়েছে। কপালে যতক্ষণ এই রক্ত থাকবে ততক্ষণ ওলাউঠা দেবী কাছে ভিড়বে না। তিনি পূজার পশুর রক্ত পছন্দ করেন না। মন্ত্রপূত একটা কালো ছাগলের গলা সামান্য কেটে ছেঁড়া দেয়া হলো। যন্ত্রণাকাতর এই পশু যদিকে যাবে তার পেছনে পেছনে যাবেন ওলাদেবী। ছাগল যদি ভিন্ন গ্রামে গিয়ে মরে যায় দেবীকে সেখানেই থাকতে হবে। এই ছাগলটা প্রথমে ছুটে গ্রাম সীমানার বাইরে গিয়েও কী মনে করে আবার ফিরে এলো। মারা গেল বাজারের মাঝখানে।

ওলাদেবীকে দূর করার জন্যে মুসলমানরাও কম চেষ্টা চালান না। তারা গায়ে আতর মেখে ধূপকাঠি হাতে বের হলো। ওলাদেবী তাড়ানোর মুসলমানী মন্ত্র একটু ভিন্ন। দলের প্রধান বলেন—

বলা দূর যাওরে
আলী জুলফিকার
এই গেরাম ছাড়িয়া যাও
দোহাই আল্লাহর।

দলের প্রধানের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র বাকি সবাই বুক খাপড়ে জিগির ধরে—

হক নাম, পাক নাম
নাম আল্লাহর হ।
আল্লাহর নূরে নবী পয়দা
হ আল্লাহ হ।।

হরিচরণ খুব চেষ্টা করলেন ভয়াবহ এই দুর্যোগে কিছু করার জন্যে। কোনো হিন্দুবাড়িতে তিনি ঢুকতে পারলেন না। এই সময়েও জাত অজাত কাজ করতে লাগল। ওলাদেবী কিন্তু জাতভেদ করলেন না। তিনি শূদ্রের ঘরে যেমন উপস্থিত হলেন, ব্রাহ্মণের ঘরেও গেলেন। দেখা গেল তাঁর কাছে সবই সমান। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল শশী মাস্টার। যেখানেই রোগী সেখানেই তিনি। অতি আদরে রোগীর গুশ্রীষা করছেন। ডাবের পানি খাওয়াচ্ছেন। কোলে করে রোগীকে ঘর থেকে বের করছেন, আবার উঠান থেকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।

রোগের প্রকোপ সবচে' বেশি জেলেপল্লীতে। শশী মাস্টার সেখানে উপস্থিত হতেই একজন জোড়হস্ত হয়ে বলল, বাবু আমার নমশূদ। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের এখানে ঢুকবেন না।

শশী মাস্টার বললেন, কিছুদিনের জন্যে আমিও নমশূদ। এখন ঠিক আছে ?

ওলাদেবীকে আটকানোর জন্যে প্রথম খেয়া পারাপার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বান্ধবপুরের মুরব্বির পরে চিন্তাভাবনা করে ঠিক করল, খেয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্তটা ভুল। তাদের উচিত ওলাদেবীকে নদী পার করে দেয়া। দেবীর বিদায় মানেই রাহুমুজি। খেয়া বন্ধ করে দেবীকে আটকে রাখার অর্থ বিপদ মাথায় নেয়া।

দেবী দিনে চলাফেরা করেন না। উনার হাঁটাচলা সূর্য ডোবার পর। বড়গাঙে সন্ধ্যার পর খেয়া চলাচলের ব্যবস্থা নেয়া হলো। খেয়া পারাপার করবে শেখ মর্দ। অতি সাহসী মানুষ। তাকে বলে দেয়া হলো, ঘোমটায় মুখ ঢাকা কেউ যদি উঠে তাকে পার করতে হবে। তার সঙ্গে কোনো কথা বলা চলবে না। পারানি চাওয়া যাবে না। দেবী যেন নৌকায় উঠেন সেই ব্যবস্থাও করা হলো। বান্ধবপুরে সন্ধ্যার পর থেকে কাঁসার ঘন্টা বাজে, ঢোল খোল করতাল বাজে। মশাল হাতে লোকজন ছোট্টাছুটি করে।

এমন অবস্থায় রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে ঘোমটায় মুখ ঢেকে কেউ একজন শেখ মর্দর নৌকার পাশে এসে দাঁড়াল। অসীম সাহসী শেখ মর্দর বুক কেঁপে উঠল। সে কোনো কথা না বলে নৌকা ছাড়ল।

আকাশে মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘোমটা পরা তরুণী দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে আছে। তরুণীর নাম জুলেখা। একসময় সে অস্ফুট স্বরে বলল, কী সৌন্দর্য গো! কী সৌন্দর্য!

ঠিক একই সময় জুলেখার বয়সি একটা মেয়েও জাহাজে করে আটলান্টিক পার হচ্ছিল। সে একা একা জাহাজের ডেকে বসেছিল। সেও মহাসাগরের শোভা দেখে জুলেখার মতোই মুগ্ধ বিশ্বাসে বলেছিল— কী সুন্দর! কী সুন্দর!

মেয়েটি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মাদাম ক্যুরি। তিনি রেডিও অ্যাকটিভিটি আবিষ্কার করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ট্রাঙ্কের আমন্ত্রণে বেড়াতে যাচ্ছেন আমেরিকায়।

আমাদের জুলেখার সেই বৎসর স্থান হলো কেন্দুয়ার বিখ্যাত নিষিদ্ধ পল্লীতে। স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'রঙিলা নটিবাড়ি'।

Encyclopedia Britanica'র প্রাচীন সংস্করণে কেন্দুয়ার উল্লেখ ছিল। সেখানে লেখা ছিল Kendua a place for dancing girls. আনন্দদায়িনী নর্তকীদের মিলনমেলা।



রঙিলা নটিবাড়ি সোহাগগঞ্জ বাজারের শেষ মাথায়। মাছের আড়ত পার হয়েও আট-দশ মিনিট হাঁটতে হয়। রাস্তার দু'পাশে আপনাতে গজিয়ে ওঠা বেশকিছু শিমুলগাছ। যে-কেউ দেখে ভাববে কোনো এক বৃক্ষপ্রেমী চিন্তাভাবনা করে শিমুলের সারি লাগিয়েছেন। চৈত্রমাসে শিমুলের টকটকে লাল ফুল ফোটে। দেখতে ভালো লাগে। মনে হয় চৈত্রের তীব্র উত্তাপে গাছের মাথায় আগুন লেগে গেছে।

মূল বাড়ি কাঠের। উপরে টিন। মূল বাড়ি ঘিরে এক রুমের বেশ কিছু ছোট ছোট ঘর। কাঠের মূল বাড়িটা দর্শনীয়। উচ্চতায় প্রায় দোতলা বাড়ির সমান। দরজা এবং পাল্লায় ফুল লতাপাতা আঁকা। টিনের চৌচালাতেও নকশা কাটা। লখনৌ-এর বাইজি আংগুলি অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে মূল বাড়ি তৈরি করে। এই বাড়িতে তার একটা কন্যাসন্তান হয়। তার নাম বেদানা। তিন বছর বয়সে বেদানা পানিতে ডুবে মারা যায়। বেদানার মৃত্যুর পর আংগুলির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। কেউ বলে আংগুলিও মেয়ের মতো পানিতে ডুবে গেছে। আবার কারো কারো মতে আংগুলি দেশান্তরী হয়েছে।

'দেশান্তরী' শব্দটা এলাকার মানুষের অতি প্রিয়। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলেই স্বামীরা বলে, দেশান্তরী হবো, আসাম চলে যাব। দেশান্তরী হয়ে আসাম চলে যাবার বাসনার কারণ— আসাম খুব দূরের দেশ না। বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের অঞ্চল। সেখানেই আছে কামরূপ কামাক্ষ্যা। জাদুবিদ্যার দেশ। কামরূপ কামাক্ষ্যার অতি রূপবতী নারীরা পুরুষদের বশ করে চিরদিনের জন্যে রেখে দিতে পছন্দ করে। দেশান্তরী হয়ে আসাম চলে গেলে ফেরা হয় না সেই কারণেই।

জুলেখা রঙিলা নটিবাড়িতে আনন্দে আছে। জায়গাটা তার পছন্দ হয়েছে। অনেক উঁচু, প্রায় টিলার মতো। বর্ষাকালে সোহাগগঞ্জ বাজারের অনেকটা ডুবে যায়। রঙিলা বাড়ি শুধু ভেসে থাকে। দূর থেকে দেখা যায় পানির উপর নকশা কাটা কাঠের একটা বাড়ি ভাসছে। বাড়ির চারদিকে টিনের ছোট ছোট ঘরের চাল থেকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করে। সন্ধ্যাবেলা হারমোনিয়াম

এবং সারেঙ্গির শব্দ ভেসে আসে। বড়ই রহস্যময় লাগে। বর্ষাকালে এই রহস্যময় জায়গায় লোকজনকে আসতে হয় নৌকায়। বেশিরভাগ খন্দের ভাটি অঞ্চলের পয়সাওয়ালা শৌখিনদার। হাওরের মাছ বিক্রির কাঁচা টাকা নিয়ে এরা আসে। কোমরে টাকার থলি বাঁধা থাকে। একটু নড়াচড়া করলেই ঝনঝন শব্দ হয়। নটি মেয়েদের কাচা রূপার টাকা নজরানা দেয়া দস্তুর। ময়লা কাগুজে নোটে শৌখিনদারি প্রকাশ পায় না। রঙিলা বাড়ির ঘাটে যখন নৌকা ভিড়ে তখন তারা চারদিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসে। তাদের বড়ই অস্থির মনে হয়। পরিচিত কেউ দেখে ফেলল কি-না এই চিন্তাতেই তারা অস্থির।

অতিরিক্ত পয়সাওয়ালা শরিফ আদমিদের মধ্যে অস্থিরতা থাকে না। তারা বজরা নিয়ে আসে। বজরা থেকে নামে না। তাদের সঙ্গে মাহফিল করতে রঙিলা বাড়ির মেয়েদের বজরায় যেতে হয়। তবে তারা হিসেবি। টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপারে সাবধানি। হিসাব ছাড়া খরচ করে ভাটি অঞ্চলের বেকুবরা। এরা সব টাকা শেষ করে নিঃশ্ব অবস্থায় দেশে ফিরে যায়। তখনও তাদের মধ্যে হাসি থাকে। সেই হাসি অন্যরকম। যেন তারা একটা কাজের কাজ করেছে।

জুলেখা রঙিলা বাড়িতে ভর্তি হয়ে নতুন নাম নিয়েছে চান বিবি। নতুন নাম নেয়াই দস্তুর। অতীত পেছনে ফেলে আসতে হবে। যা গেছে তা গেছে। অতীত নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এও এক ধরনের সংসার। প্রতিরাতে স্বামী বদলের সংসার। এটাই মন্দ কী?

চান বিবি একটা টিনের ঘর পেয়েছে। ঘরটা তার বড়ই পছন্দের। সামনেই বড়গাঙ। ঘরের বারান্দায় বসে থাকলে বড়গাঙ ছাড়িয়ে দৃষ্টি অনেক দূরে চলে যায়। তখন খুব উদাস লাগে। ঘরের সামনেই বিশাল এক কামরাঙা গাছ। এই গাছে সারা বছরই কামরাঙা হয়। ভয়ঙ্কর টক, কাক দেশান্তরী জাতের কামরাঙা (কাক দেশান্তরী : যে টক ফল খেলে কাক দেশান্তরে পালিয়ে যায়)। এই গাছটাও চান বিবির পছন্দ। গাছের নিচে বসলে চিড়ল চিড়ল পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে গায়ে পড়ে। এত ভালো লাগে। চান বিবি ঠিক করেছে, তার যদি কিছু টাকা-পয়সা হয় তাহলে সে কামরাঙা গাছের তলাটা নিজ খরচে বাঁধিয়ে দেবে। বাঁধানো ঘাটে শীতলপাটি বিছানো থাকবে। শীতলপাটির উপরে পরিষ্কার ফুলতোলা বালিশ। কখনো সে বালিশে গুয়ে আকাশ দেখবে। আবার কখনো গাছে হেলান দিয়ে অতি দূরের গ্রামের সীমানা দেখবে।

চান বিবির ফুট ফরমাস খাটার জন্যে তাকে সাত-আট বছরের একটা মেয়ে দেয়া হয়েছে। মেয়েটার নাম হাছুন। চান বিবি হাছুনকে নিজের মেয়ের মতো যত্ন করে। মাথায় তেল দিয়ে চুল বেঁধে দেয়। সপ্তাহে একদিন জলেভাসা সাবান

দিয়ে তার গা ডলে দেয়। হাছুন চান বিবিকে মা ডাকে। সারাদিনই সে ঘর পরিষ্কার করে। সন্ধ্যাবেলা কার্তিকের মূর্তিতে প্রদীপ জ্বেলে দেয়। ধূপদানে ধূপ জ্বালে। রঙিলা বাড়ির প্রতিটি ঘরেই কার্তিকের মূর্তি আছে। কার্তিক পতিতাদের দেবতা। পতিতা হিন্দু হোক মুসলমান হোক, তার ঘরে কার্তিকের মূর্তি থাকবেই।

রঙিলা বাড়ির মালেকাইন হিন্দুস্থানি। নাম সরজুবালা। এই হিন্দুস্থানি মালেকাইনকেও চান বিবির পছন্দ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। গায়ের রঙ পাকা ডালিমের মতো। সন্ধ্যাবেলা তিনি যখন চোখে কাজল দিয়ে সারেঙ্গি নিয়ে বসেন তখন তাকে দেখলে চান বিবির অদ্ভুত লাগে। তার কাছে মনে হয় এই মহিলা পৃথিবীর কেউ না। অন্য কোনো জগতের। তার গানের গলাও চমৎকার। মীরার ভজন গাওয়ার সময় সরজুবালার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ে। এই দৃশ্য দেখেও চান বিবি মুগ্ধ।

রঙিলা বাড়িতে প্রথম ঢোকান পর মালেকাইন তাকে সামনে বসিয়ে গায়ে হাত রেখে যে কথাগুলি বলেন, সে কথাগুলি চান বিবির মনে গেঁথে আছে। তিনি কথা বলেন বাংলা এবং হিন্দুস্থানি মিশিয়ে। সেই কথাও চান বিবির গানের মতো লাগে।

শোন জুলেখা, তুমি রূপ নিয়ে দুনিয়াতে আসছ। গরিব ঘরের মেয়ে। এইটাই তোমার পাপ। যে নিজেই পাপ তার কপালে পাপ ছাড়া আর কী থাকবে? সে তো পাপের বাড়িতেই ঢুকবে। এই বাড়িতে পাপ কাটার ব্যবস্থা কিন্তু আছে। যে পুরুষ তোমার কাছে আসবে, সে যদি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয় তাহলে তোমার কিছু পাপ কাটা যাবে। কারণ মানুষ ভগবান। মানুষকে তুষ্ট করা ভগবানকে তুষ্ট করা একই জিনিস।

তোমার রূপ আছে। সেই রূপ ধরে রাখতে হয়। রূপ ধরে রাখার নিয়মকানুন আছে। আমি তোমাকে শেখাব। তোমার যদি গানের গলা থাকে আমি তোমাকে গান শেখাব। নাচ শেখাব। যদি তোমার কপালে থাকে, তুমি বহু টাকা উপার্জন করবে। যারা তোমার কাছে আসবে, তাদের মধ্যে কারো সঙ্গে যদি আশনাই হয় তাকে বিবাহ করতে পার। আমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়া খাদ্যের মধ্যে নিরামিষ থাকবে। নিরামিষ শরীর ঠিক রাখবে। শরীরই আমাদের সম্পদ— এটা মাথায় রাখবে।

ড্যান্স মাস্টার তোমাকে নাচ শেখাবে। শরীরের ভেতরে যদি নাচ থাকে তাহলে নাচ শিখতে পারবে। যদি না থাকে, তাহলে শিখতে পারবে না। তারপরেও ড্যান্স মাস্টার তোমাকে নাচ শেখাবে। নাচ করলে শরীর ঠিক

থাকবে। ঠিকমতো নাচ করলে মন ঠিক থাকে। সেবাদাসীরা মন্দিরে দেবতার সামনে নাচ করে শরীর এবং মন দু'টাই ঠিক রাখে।

আমাদের এই বাড়িটাও মন্দির। যেসব পুরুষ এই বাড়িতে আনন্দের খোঁজে আসে তারা দেবতা।

কখনো নিলাজ হবে না। পুরুষমানুষ নটি বেটির কাছেও লজ্জা আশা করে। কোনো যক্ষ্মারোগীকে ঘরে নিবে না। যত টাকাই সে দিক তাকে ঘরে নেয়া যাবে না। যক্ষ্মারোগী চেনার উপায় আছে। আমি তোমাকে শিখায়ে দেব। তোমার স্বামী, স্বামীর দিকের আত্মীয় কাউকে ঘরে নিবে না। স্বামীকে কোনো অবস্থাতেই না। খদ্দেরদের কারো কারো স্ত্রীরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাদের সঙ্গে কখনো কোনো অবস্থায় দেখা করবে না। খদ্দের আমাদের দেবতা। খদ্দেরের স্ত্রীরা উপদেবতা। উপদেবতার ভয়ঙ্কর। তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়।

যদি কখনো মনে কর এই জায়গা, এই জীবন তোমার পছন্দ না, তুমি চলে যেতে চাও, তাহলে চলে যাবে। কেউ তোমাকে আটকাবে না। আমি জেলখানা খুলে বসি নাই। দুঃখী মানুষের জন্যে আনন্দ-ফুটির ব্যবস্থা করেছি। মানুষকে আনন্দ দেয়ার মধ্যে পুণ্য আছে। তুমি নিজেও আনন্দে থাকার চেষ্টা করবে।

চান বিবি আনন্দে থাকার চেষ্টা ছাড়াই আনন্দে আছে। নতুন জীবনের শুরুতে প্রথম পুরুষটিকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাটি অঞ্চলের বোকাসোকা চেহারার একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। ফর্সা, লম্বা। চোখেমুখে দিশাহারা ভাব। সে খুব ভয়ে ভয়ে বিছানায় পেতে রাখা শীতলপাটিতে বসল। পকেট থেকে ফুলতোলা ময়লা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। বিড়বিড় করে বলল, পানি খাব।

চান বিবি ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে পানি এনে দিল। লোকটা এক চুমুক পানি খেয়েই গ্লাস নামিয়ে রাখতে রাখতে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, খুবই গরম।

চান বিবি বলল, বাতাস করব ?

না, বাতাস লাগবে না।

দরজার আড়ালে হাছুন উকিঝুঁকি দিচ্ছিল। চান বিবি তাকে ইশারা করতেই সে তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস শুরু করল। লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার মেয়ে ?

চান বিবি বলল, আমার মেয়ে না। তবে মেয়ের মতোই। আমাকে আপনি আপনি বলতেছেন কী কারণে ? আমি বয়সে আপনার ছোট।

লোকটি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই।

চান বিবি বলল, চলে যাবেন ? কিছুক্ষণ জিরান । বাতাস খান । শরীর ঠাণ্ডা করেন । মন ঠাণ্ডা করেন । আসেন, গল্প করি ।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বসল । আবার পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল । তবে এবার রুমালটা পকেটে ঢুকাল না । হাতে নিয়ে বসে রইল । চান বিবি বলল, রুমালে সুন্দর ফুলের কাজ । কে করেছে ? আপনার স্ত্রী ?

হঁ ।

আপনার ছেলেমেয়ে আছে ?

দুই মেয়ে ।

তারা দেখতে সুন্দর ?

হঁ ।

আপনার স্ত্রীর চেহারা কেমন ? সুন্দর ?

হঁ ।

আমার চেয়েও সুন্দর ?

না ।

আপনি কি কিছু খাবেন ? শরবত বানায়ে দিব ?

না ।

ঘরে মিষ্টি আছে । মিষ্টি দিব ? বেগমগঞ্জের লাড্ডু ।

না ।

আপনার স্ত্রীর নাম কী ? বলতে না চাইলে বলতে হবে না । বলতে ইচ্ছা করলে বলেন ।

তার নাম বলব না ।

মেয়ে দু'টার নাম কী ? বলতে না চাইলে বলতে হবে না । বলতে ইচ্ছা করলে বলেন ।

বড় মেয়ের নাম শরিফা । ছোট মেয়ের নাম তুলা ।

তুলা নাম রেখেছেন কেন ? জন্মের সময় খুব হালকা ছিল ?

হঁ । সাত মাসে হয়েছে । বাঁচার আশা ছিল না । হালিমা তাকে শিমুল তুলার বস্তায় ভরে বাঁচিয়ে রেখেছিল । এখন তুলার স্বাস্থ্য খুবই ভালো । সারাদিন মারামারি করে । কামড় দেয়া শিখেছে । কামড় দিয়ে রক্ত বের করে দেয় ।

আপনার স্ত্রীর নাম হালিমা ?

হঁ ।

নাম বলে ফেলেছেন, এখন কি আপনার খারাপ লাগছে ?

লোকটা চুপ করে রইল। প্রসঙ্গ পাল্টে জুলেখা বলল, আপনার মেয়ে তুলা আপনাকে কামড়ায় ?

অনেকবার। আমার সারা গায়ে তার কামড়ের দাগ। সে শুধু তার মা'রে কামড়ায় না।

চান বিবি বলল, আপনার মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গেল। কয়েকবার টোক গিলে পাঞ্জাবির পকেট থেকে কালো কাপড়ের ছোট থলি বের করে পাশে রাখতে রাখতে বলল, এখানে দশটা রুপার টাকা আছে। টাকার পরিমাণ কি ঠিক আছে ?

চান বিবি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। লোকটা উঠে দাঁড়াল। চান বিবি বলল, চলে যাবেন ?

হঁ।

বিশ্রাম করেন। রাতটা থাকেন, সকালে যান।

না।

তাহলে আরেকদিন আসেন। সেদিন টাকা ছাড়াই আসেন।

আমি আর আসব না।

আমার উপর কোনো কারণে কি আপনি নারাজ হয়েছেন ?

না। তুমি ভালো মেয়ে।

আপনার স্ত্রীর চেয়েও কি ভালো ?

লোকটার চেহারা সামান্যক্ষণের জন্যে কঠিন হয়ে গেল। চান বিবি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। কঠিন মুখভঙ্গি সহজ হলো। লোকটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না।

রুপার টাকার থলেটা চান বিবি সরজুবালার কাছে পাঠিয়ে দিল। এটাই নিয়ম। সরজুবালা সেখান থেকে নিজের অংশ রেখে ফেরত পাঠাবেন। চান বিবির পুরো টাকাই সরজুবালা ফেরত পাঠালেন। প্রথম রোজগারে ভাগ বসালেন না। চান বিবি প্রথম রোজগারের টাকায় তার ছেলে জহিরের জন্যে জামা, জুতা কিনল। বান্ধবপুর জুম্মা মসজিদের ইমাম সাহেবের জন্যে একটা তুর্কি ফেজ টুপি কিনল। শশী মাস্টারের জন্যে কিনল নকশি করা সিলেটের শীতলপাটি। জিনিসগুলি হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ কাঁদল।

অদ্ভুতের একটি মেয়ের স্থান হয়েছে রঙিলা বাড়িতে— এই ঘটনা বান্ধবপুরে কোনো আলোড়ন তুলল না। অনেক দিন এই বিষয়টা কেউ জানলও না। সুলেমান সবাইকে বলল, স্ত্রীকে সে তালাক দিয়েছে। স্ত্রী চলে গেছে তার বাপ-

ভাইয়ের কাছে। মুসলমান সমাজে স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং স্ত্রীর বাপ-ভাইয়ের কাছে চলে যাওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এক স্ত্রী চলে যাবে অন্য স্ত্রী আসবে। স্ত্রী একা আসবে না, সঙ্গে দাসী নিয়ে আসবে। স্ত্রীর গর্ভে যেমন সন্তান হবে, দাসীর গর্ভেও হবে। স্ত্রীর গর্ভের সন্তানরা সম্পত্তির ভাগ পাবে। বান্দির গর্ভের সন্তানরা পাবে না। তারা কামলা খাটবে। তাদের বিয়েশাদি হবে তাদের মতোই বান্দি বংশের লোকজনদের সঙ্গে। সহজ হিসাব।

তখনকার ব্যবস্থায় রঙিলা বাড়ি এমন কিছু খারাপ জায়গা না। পুরুষ মানুষদের আমোদ-ফুটির অধিকার আছে। তারা খাটাখাটনি করে অর্থ উপার্জন করে। সেই অর্থের খানিকটা যদি নিজের আনন্দের জন্যে ব্যয় করে, তাতে ক্ষতি কী? পুরুষ মানুষ দিনরাত স্ত্রীর আঁচলে বাঁধা থাকলে ধরতে হবে সে পুরুষ মানুষই না। তার কোনো সমস্যা আছে। ক্ষমতাবান পুরুষদের হতে হবে শৌখিনদার। তারা বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার করবে। রঙিলা বাড়িতে যাবে। কিছুদিনের জন্যে বাড়িতে ঘাটুগানের ছেলে নিয়ে আসবে। ঘাটুগানের এইসব ছেলে নৃত্যবিদ্যা এবং সঙ্গীতে পারদর্শী। শৌখিনদার পুরুষের নানান আবদার (!) এরা মিটাবে। এইসব কর্মকাণ্ডে স্ত্রীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার কিছু নাই। ঘাটুছেলেরা তাদের সতিন না। এরা কিছুদিনের জন্যে এসেছে। সতিনের মতো চিরস্থায়ী সত্ত্ব নিয়ে আসে নি।

বান্দিবপুর সেই সময় অতি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। রমরমা পাটের ব্যবসা। লবণের ব্যবসা। মাছের ব্যবসা। নতুন লঞ্চঘাট হয়েছে। দিনরাত লঞ্চের ভোঁ শোনা যায়। বরফকল বসেছে। প্যাটারায় বরফ ভর্তি হয়ে দৈত্যকৃতির মাছ চলে যায় নারায়ণগঞ্জ, কোলকাতায়। জলমহাল নিয়ে মারামারি খুনাখুনি হয়। সাহেব পুলিশ অফিসার হাতিতে করে তদন্তে আসেন। তদন্ত শেষে পাখি শিকার করেন। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে রঙিলা উৎসব হয়। নর্তকীরা নাচ-গান করে। ঘাটুছেলেরা বুকে নারিকেলের মালা বেঁধে ঠোঁটে রঙ দিয়ে অশ্লীল ভঙ্গিমায়ে অতি নোংরা গান ধরে। সাহেবরা ঘনঘন মাথা নেড়ে বলেন, Not bad, Not bad at all.

এই বিপুল কর্মকাণ্ডে আমাদের জুলেখা অতি নগণ্য একজন। আপাতত তার কথা থাকুক। আমরা চলে যাই হরিচরণের স্কুলে। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা নয়। নয়জনের মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান। তার নাম জহির। এই ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হবে। অতিরিক্ত ভালো। স্মরণশক্তি অসাধারণ। একবার কিছু পড়লেই তার মনে থাকে। শশী মাস্টার তার এই ছাত্রটিকে কোনো এক বিচিত্র কারণে সহ্য করতে পারেন না।

ব্রিটিশ সরকার সে সময়ে একটি বৃত্তি চালু করেছিলেন। সমগ্র ভারতে ক্লাস টু'র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই বৃত্তি দেয়া হতো। মাসিক দু'টাকা হারে এক বৎসরের জন্যে বৃত্তি। সুলেমানের ছেলে জহির এই বৃত্তি পেয়ে সবাইকে চমকে দিল। জেলা শিক্ষা অফিসার আলহাজ রমিজউদ্দিন সাহেব বৃত্তির খবর নিয়ে বান্ধবপুরে উপস্থিত হলেন। জহিরের মাথায় হাত রেখে চোখ বন্ধ করে দোয়া করলেন। তারপর জহিরকে কাছে টেনে গলা নামিয়ে বললেন, তোমার মা নাকি তোমাদের সঙ্গে থাকে না। এটা কি সত্য?

জহির বলল, সত্য।

সে থাকে কোথায়?

জহির চুপ করে রইল। জবাব দিল না।

কোথায় থাকে জানো না?

জহির এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। আলহাজ রমিজউদ্দিন গলা আরো খাদে নামিয়ে বললেন, লোকমুখে শুনলাম তোমার মা রঙিলা নটিবাড়িতে থাকে, এটা কি সত্য?

সত্য।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। যা হয় সবই আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়। উনার হুকুম বিনা কিছু হয় না। তুমি নিজের মতো লেখাপড়া চালিয়ে যাবে। তোমার মা কোথায় থাকে কী সমাচার তা নিয়া মাথা ঘামাবে না। ঠিক আছে?

হঁ।

হঁ না, বলো জি আচ্ছা, জনাব। এইসব সহি আদব। শুধু লেখাপড়া শিখলে হবে না। আদবও শিখতে হবে। বলো, জি আচ্ছা, জনাব।

জি আচ্ছা, জনাব।

আলহাজ্ব রমিজউদ্দিন জহিরকে একটা ফাউন্টেনপেন উপহার হিসেবে দিয়ে গেলেন। ফাউন্টেনপেনের নাম রাইটার।

শশী মাস্টারের কাছে জুলেখার শীতলপাটি পৌছেছে। যে নিয়ে এসেছে তার নাম সামছু সদাগর। মিশাখালি বাজারে তার পাটের আড়ত। শশী মাস্টার বললেন, পাটি কে দিয়েছে?

সামছু সদাগর বললেন, রঙিলা নটিবাড়ির এক নটি দিয়েছে। রাখলে রাখেন, না রাখলে ফেলে দেন। নটির নাম চান বিবি।

চান বিবি নামে কাউকে আমি চিনি না।

আপনি মাস্টার মানুষ। আপনার না চেনাই ভালো। তার আরেক নাম
জুলেখা।

জুলেখা ?

সামছু সদাগর বললেন, এখন কি চিনেছেন ?

হ্যাঁ চিনেছি।

পরিচয় ছিল আপনার সাথে ?

ছিল।

চাইপা যান। কাউরে কবেন না। মাস্টার সাব, উঠি ?

শশী মাস্টার সারা দুপুর ঝিম ধরে বসে রইলেন। সন্ধ্যার পর কলের গান
ছেড়ে জামগাছের নিচে গভীর রাত পর্যন্ত বসে রইলেন।

মাওলানা ইদরিসের কাছে জুলেখার পাঠানো তুর্কি টুপি পৌছেছে। সামছু
সদাগরই নিয়ে গেছে।

মাওলানা বললেন, আপনারে তো চিনলাম না।

সামছু সদাগর বললেন, আমারে চেনার প্রয়োজন নাই। আপনার কাছে
একটা জিনিস পৌছিয়ে দেওয়ার কথা। দিলাম।

জিনিসটা দিয়েছে কে ?

চান বিবি দিয়েছে।

চান বিবিকে তো চিনি না!

সামছু সদাগর উদাস গলায় বললেন, এখন তারে না চেনাই ভালো। সময়ে
চেনা সময়ে না-চেনা বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ। আপনি বুদ্ধিমান।

মাওলানা ইদরিস বললেন, একজন এত সুন্দর একটা টুপি পাঠিয়েছে, তারে
চিনব না— এটা কেমন কথা ?

সামছু বলল, চিনতে হইলে রঙিলা নটি বাড়িতে যান। ঐ মেয়ে রঙিলা
বাড়ির নটি।

মাওলানা হতভম্ব গলায় বললেন, এইটা কী কথা ?

সত্য কথা। নটি বেটি আপনারে টুপি পাঠিয়েছে। বড়ই সৌন্দর্য মেয়ে।
বেহেশতের হর বরাবর সুন্দর। তার টুপি আপনি মাথায় দিয়ে জুম্মার নামাজ
পড়বেন, না গাঙের পানিতে ফেলবেন— এটা আপনার বিবেচনা। আমি
উঠলাম।

তুর্কি ফেজ টুপিটা টিনের ট্রাক্টের উপর রাখা। টুপিটা কোথেকে এসেছে মাওলানা এখন বুঝতে পারছেন। এই টুপি মাথায় দেয়ার প্রশ্নই আসে না। গাঙের পানিতে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। টুপির মতো পবিত্র একটি বস্তু পানিতে ফেলে দেওয়া কি ঠিক? এই বিষয়ে হাদিস কোরানের পরিষ্কার ব্যাখ্যা কী তাও তিনি জানেন না। কাউকে যে জিজ্ঞেস করবেন তাও সম্ভব হচ্ছে না। হাদিস কোরান জানা লোক আশেপাশে কেউ নেই। তাঁর খুবই ইচ্ছা দেওবন্দ মাদ্রাসায় যাওয়া। তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন আছে। তিনি হাতির ছবিআঁকা একটা দু'নশ্বরী খাতায় প্রশ্নগুলি লিখে রেখেছেন। যেমন, রোজার সময় ধূমপান করলে কি রোজা ভাঙে? চিংড়ি মাছ খাওয়া মকরুহ। কাঁকড়া খাওয়াও কি মকরুহ? মাওলানা টুপি বিষয়ক একটি প্রশ্ন খাতায় লিখলেন।

কোনো ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) যদি অসৎপথে উপার্জন করা অর্থের বিনিময়ে কাউকে টুপি, তসবিহ কিংবা জায়নামাজ দেয় তখন সেই টুপি, তসবিহ, জায়নামাজ ব্যবহার করা কি জায়েজ আছে?

টুপিটা ঘরে আসার পর থেকে মাওলানা ভালো সমস্যায় আছেন। প্রায়ই রাতে জুলেখাকে স্বপ্নে দেখছেন। স্বপ্নের ধরন দেখে তিনি নিশ্চিত স্বপ্নগুলি ইবলিশ শয়তান দেখাচ্ছে। একটি স্বপ্নে তিনি দেখলেন জুলেখা তার স্ত্রী (নাউজুবিল্লাহ)। সে তাঁর বাড়িতেই থাকে। ঘরদুয়ার ঠিকঠাক রাখে। রান্না করে। রাতে সব কাজকর্ম শেষ করে বানানো পান হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘুমাতে আসে (নাউজুবিল্লাহ)।

এরচেয়েও খারাপ স্বপ্ন একবার দেখলেন। এমন স্বপ্ন যা কাউকে বলা যাবে না। তাঁর অত্যন্ত মনখারাপ হলো। ইবলিশ শয়তান কোনো এক জটিল খেলা শুরু করেছে, এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাঁর মতো নাদান মানুষ কীভাবে শয়তানের হাত থেকে বাঁচবেন? তাঁর কতটুকুই বা ক্ষমতা? হযরত আদমের মতো মানুষ শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারেন নাই। এমনকি একবার আমাদের নবিজিকেও শয়তান ধোঁকা দিয়েছিল। নবিজির মুখ দিয়ে ওহি হিসেবে মিথ্যা আয়াত বলিয়েছিল।*

গভীর রাতে ইবলিশ শয়তান কিংবা তার সাঙ্গপাঙ্গ যে তাঁর বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করে, গাছের ডাল নড়ায়, এটা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন। বাতাস নেই কিছু নেই, গাছের ডাল নড়ছে। একবার রাতে তসবি পড়ছিলেন, হঠাৎ পেছনের জানালা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। আবার খুলল। আরেক রাতে

* Satanic Verses

তাহজ্জুতের নামাজ পড়বেন, অজু করার জন্যে বারান্দায় রাখা জলচৌকিতে বসেছেন। অজুর দোয়া পড়ে শেষ করলেন। দোয়ার অর্থ—

নাপাকি দূর করিবার, নামাজ শুদ্ধভাবে পড়িবার এবং আল্লাহ
তা'লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আমি অজু করিতেছি।

অজুর দোয়া শেষ করামাত্র তাঁর মনে হলো কেউ একজন তার ঘাড়ে ফু দিয়েছে। গরম বাতাস। তিনি প্রচণ্ড ভয় পেলেও পেছন ফিরে তাকালেন না। অজু শেষ করলেন। তখন কেউ একজন পেছন থেকে হেসে উঠল। মেয়ে মানুষের গলা। তিনি চমকে পেছনে ফিরলেন, কাউকে দেখলেন না, তবে তাঁর হাতের ধাক্কা লেগে পিতলের বদনা জলচৌকি থেকে নিচে পড়ে গেল। বদনা উঠাতে গিয়ে দেখেন বদনার ভেতর একটা হুঁদুরের বাচ্চা মরে পড়ে আছে। ইবলিশ শয়তান অজু নষ্ট করার জন্যে একটা হুঁদুরের বাচ্চা বদনার পানিতে রেখে দিয়েছিল।

এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা বাড়িতে ফিরে রান্না বসিয়েছেন। চালডালের খিচুড়ি। এক চামচ ঘি দিয়েছেন, সুন্দর গন্ধ ছেড়েছে। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কাছে মনে হলো শুকনা পাতায় খসখস শব্দে কেউ একজন আসছে। মাওলানা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শয়তানার উপদ্রব আবার শুরু হয়েছে। মাওলানা আয়াতুল কুরসি পাঠ করে হাততালি দিলেন। তখন মনে হলো উঠানে কে একজন কাশছে। মাওলানা ভীত গলায় বললেন, কে কে ?

আমি।

আমি কে ? আমি কে ?

মাওলানা হারিকেন হাতে বের হয়ে এলেন। চাদর গায়ে হরিচরণ দাঁড়িয়ে আছেন। একহাতে বেতের একটা লাঠি। অন্য হাতে হারিকেন। সঙ্গে আর কেউ নেই।

কেমন আছেন মাওলানা সাহেব ?

জি জনাব, ভালো। আপনি এত রাতে!

রাত তো বেশি হয় নাই। আপনি কি আমাকে দেখে ভয় পেয়েছেন ?

মাওলানা বললেন, সামান্য ভয় পেয়েছি। আমার কাছে কোনো কারণে কি এসেছেন ?

হরিচরণ বললেন, ছোট্ট একটা কারণ আছে। শুনেছি আপনি পুরো কোরান শরীফ মুখস্থ করেছেন, এটা কি সত্য ?

মাওলানা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। লজ্জিত গলায় বললেন, হাফেজ টাইটেল এখনো পাই নাই। কোনো বড় মাদ্রাসায় গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। যেমন ধরেন দেওবন্দ মাদ্রাসা।

পরীক্ষা দিতে যান না কেন?

খরচপাতি আছে। আমি দরিদ্র মানুষ। অর্থের সংস্থান নাই।

হরিচরণ বললেন, আমি খরচ দিলে কি যাবেন?

মাওলানা চুপ করে রইলেন। হরিচরণ বললেন, আপনাদের ধর্মে কি আছে যে অমুসলমানের সাহায্য নেয়া যাবে না?

এরকম কিছু নাই।

তাহলে আমার সাহায্য নিন। দেওবন্দ থেকে ঘুরে আসুন।

জি আচ্ছা। বহুত শুকরিয়া।

হরিচরণ সামান্য ইতস্তত করে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ কি করতে পারি?

মাওলানা বললেন, অবশ্যই।

আপনার মুখস্থবিদ্যার একটা নমুনা কি আমাকে শোনাবেন?

মাওলানা বললেন, অবশ্যই। অজু করে আসি।

অজু করতে হবে?

জি। নাপাক অবস্থায় কোরান মজিদ আবৃত্তি করা ঠিক না।

হরিচরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। মাওলানা ইদরিস জায়নামাজে বসে কোরান আবৃত্তি করছেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

একসময় কোরান পাঠ শেষ হলো। মাওলানা বললেন, খিচুড়ি পাক করেছে। আপনি কি আমার সঙ্গে খানা খাবেন?

অমুসলিমকে খানা খাওয়াতে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই?

জি-না। সমস্যা কী জন্যে থাকবে?

আপনাদের ধর্মের এই জিনিসটা ভালো। আমি আগ্রহের সঙ্গেই খানা খাব। একজনের জন্যে রঁধেছেন। দুইজনের কি হবে?

বেশি করে রঁধেছি। যেটা বাঁচে সেটা দিয়ে সকালে নাশতা করি।

হরিচরণ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, আরাম করে খেয়েছি। ধন্যবাদ।

মাওলানা বললেন, ধন্যবাদ কেন? আপনার তো আজ রাতে আমার এখানেই খাওয়ার কথা। সব আগে থেকে ঠিক করা।

হরিচরণ বিস্মিত হয়ে বললেন, কে ঠিক করেছে ?

আল্লাহপাক ঠিক করেছেন। মানুষ পশুপাখি সবার রিজিক আল্লাহপাক নিজে ঠিক করে রাখেন। কে কবে কোথায় খানা খাবে সেটা তার জন্মের সময়ই ঠিক করা।

উঠানের কাঁঠালগাছের ডাল নাড়ছে। টিনের চালে শব্দ হচ্ছে। মাওলানা দুঃখিত গলায় বললেন, একটা শয়তান কিছুদিন ধরে বড়ই ত্যক্ত করছে।

হরিচরণ বললেন, কী বলছেন এইসব ?

হরিচরণের কথা শেষ হবার আগেই বিকট শব্দে জানালার পাল্লা বন্ধ হলো। হরিচরণ চমকে উঠলেন। মাওলানা বললেন, চলুন আপনাকে বাড়িতে দিয়ে আসি। একা যেতে পারবেন না। ভয় পাবেন।

হরিচরণ উঠে দাঁড়ালেন।

মাওলানা হারিকেন হাতে আগে আগে যাচ্ছেন। পেছনে পেছনে হরিচরণ। তিনি বেশ ভয় পাচ্ছেন।

হরিচরণ বললেন, আপনি একা বাস করেন, ভয় পান না ?

পাই। তবে দোয়াকালাম আছে। দোয়াকালাম পাঠ করি।

আপনার একা একা থাকা ঠিক না। একটা বিবাহ করেন।

জি, বিবাহ করব। আমাদের ধর্মে সংসার করার নির্দেশ আছে।

কন্যা কি ঠিক করেছেন ?

জি-না। আল্লাহপাক ব্যবস্থা করে দিবেন। যথাসময়ে শুভ কার্য সমাধা হবে। রিজিকের মতো বিবাহ উনার নির্দেশে হয়।

হরিচরণ ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সেই অর্থে সব কিছুই তাঁর নির্দেশে হওয়ার কথা।

মাওলানা বললেন, পাঁচটা বিষয় আলাদা করে বলা আছে— হায়াত, মউত, বিবাহ, রিজিক এবং দৌলত।

হরিচরণ বললেন, আপনাকে আর আসতে হবে না। এখন যেতে পারব। এক কাজ করলে কেমন হয়— এখন আমি আপনাকে এগিয়ে দেই। তারপর আবার আপনি আসবেন। এই করতে করতে রাত কাবার।

মাওলানা হাসছেন। হাসির স্বরধাম বেশ উঁচু। তিনি জানেন এইভাবে উচ্চস্বরে হাসা ঠিক না। নবিয়ে করিম উচ্চস্বরে হাসতেন না। সমস্যা হলো, মানুষের নিজের উপর সবসময় দখল থাকে না।

হরিচরণ বাড়িতে ঢুকলেন। দিঘির বাঁধানো ঘাটে বসে রইলেন। মাওলানার বাড়িতে ভয় ভয় লাগছিল। এখানে লাগছে না। যদিও এই জায়গাটাও নির্জন এবং জঙ্গুলে। দিঘির চারদিকের ঘাস মানুষ সমান উঁচু হয়েছে। মাঝে মাঝে ঝুপড়ি ভাটগাছ। ভাটফুল গন্ধবিহীন হলেও রাতে হালকা নেশা ধরানো গন্ধ ছাড়ে। পাকাবাড়ির সামনে কামিনী ফুলের ঝাড়। কামিনী ফুলের সুবাসও রাতেই পাওয়া যায়। পূজায় ব্যবহারের জন্যে রক্তজবার বেশ কিছু গাছ নানান দিকে লাগানো আছে। জবাফুল গন্ধবিহীন কিন্তু হরিচরণের মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি জবা ফুলের গন্ধও পান। এটা একধরনের ভ্রান্তি। তিনি জানেন, মানুষকে সারাজীবনই নানান ভ্রান্তির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। হরিচরণের মা গোলাপদাসির ক্ষেত্রে এরকম হয়েছিল। শেষ বয়সে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল, দিঘিটা গঙ্গার অংশ।

গঙ্গায় তর্পনের ভঙ্গিতে তিনি দিঘিতে প্রায়ই এটা সেটা দিতেন। ফুল, মিষ্টি, দেবতার ভোগ। শেষের দিকে পিতলের হাঁড়ি বাসন, সোনাদানা ফেলতে লাগলেন। হরিচরণের ধারণা, দিঘির জল সেঁচে ফেললে অনেক জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। বিশাল দিঘির জল সিঞ্চন সহজ ব্যাপার না। তারপরেও একবার চেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

হরিচরণ গায়ের চাদর বিছিয়ে শ্বেতপাথরের ঘাটে গুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁর সুনিদ্রা হলো।

বান্ধবপুরের বর্তমান আলোচনার বিষয় মাওলানা ইদরিসের বাড়িতে হরিচরণ গো-মাংস খেয়েছেন। বিষয়টা নিয়ে হৈচৈ শুরু করেছেন অম্বিকা ভট্টাচার্য। বিভিন্ন দিকে নানা দেনদরবার করছেন। হরিচরণ আগেই জাতিচ্যুত হয়েছেন। গো-মাংস ভক্ষণজনিত গুরুতর অপরাধে নতুন করে কিছু হবার কথা না। তারপরেও অম্বিকা ভট্টাচার্য যথেষ্ট ঘোঁট পাকিয়ে ফেলেছেন। হরিচরণ এবং মাওলানা ইদরিস দুজনেই গুরুতর অপরাধ করেছে। একজন গো-মাংস খেয়েছে, আরেকজন ধর্ম নষ্ট করার জন্যে খাইয়েছে। এই দুজনকেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

বান্ধবপুরের সীমান্তে জাগ্রত বটগাছের নিচে যে বটকালি মন্দির সেই মন্দিরের মূর্তি মাথা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। অম্বিকা ভট্টাচার্য নিশ্চিত, এই ভয়াবহ অন্যায় কার্যের পেছনেও আছে মাওলানা ইদরিস। কারণ কয়েক দিনই তাকে এই রাস্তায় যাতায়াত করতে দেখা গেছে। তাছাড়া মা কালী স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইশারায় তাকে বলেছেন, মূর্তি যে ভঙেছে তার মুখভর্তি দাড়ি।

শাল্লার দশআনি মুসলমান জমিদার নেয়ামত হোসেন মাওলানা ইদরিসকে ডেকে বলেছেন, আপনি কী শুরু করেছেন! গো-মাংস রোধে রোধে খাওয়াচ্ছেন।

ইদরিস বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, গো-মাংস কোথায় পাব বলেন ? বান্ধবপুরে গরু জবেহ হয় না।

কথা কম বলেন। লম্বা দাড়ির মানুষ কথা বেশি বলে। আপনার দাড়ি লম্বা। জলে বাস করলে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না। বাস করেন হিন্দু অঞ্চলে। হিন্দুরা এখানে কুমির। কিছু বুঝেছেন ?

জি, বুঝেছি।

কিছুই বুঝেন নাই। আপনি হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাধাতে চান— এটা এখন পরিষ্কার। কোন সাহসে আপনি কালীমূর্তি ভাঙলেন ?

জনাব এই কাজ আমি করি নাই।

আপনি না করলেও আপনার নির্দেশে হয়েছে। এই বিষয়ে আমার কাছে খবর আছে। রঙিলা বাড়িতেও আপনি কয়েকবার গিয়েছেন। চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে গিয়েছেন। এই বিষয়েও আমার কাছে খবর আছে।

মাওলানার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি পাঞ্জাবির আস্তিনে ঘনঘন চোখ মুছছেন। তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই দৃশ্য নেয়ামত হোসেনকে মোটেই স্পর্শ করল না। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আপনার মাসিক বৃত্তি আজ থেকে আমার স্টেট আর দিবে না। আপনি অন্য কোথাও চলে যান। আপনার কারণে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে, এটা বুঝেছেন ?

জি, জনাব।

নানান জায়গায় হিন্দু মুসলিম হাঙ্গামা হুজ্জত হচ্ছে। আমি আমার অঞ্চলে এটা হতে দেব না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে আমাকে পত্র দিয়েছেন।

জনাব, আমার কাঁধের দুই ফেরেশতা কেরামন কাতেমিন সাক্ষী, আমি কিছুই করি নাই।

আপনি দুই ফেরেশতাকে সাক্ষী মেনেছেন। খুবই ভালো কথা। এরা কোর্টে উকিলের জেরার জবাব দিবে না। এটা বোঝার মতো বুদ্ধি কি আপনার আছে ? আমার তো মনে হয় নাই। আচ্ছা এখন বিদায় হন, অনেক কথা বলে ফেলেছি।

মসজিদের কাজ কি তাহলে আর করব না ?

না। তবে যদি সব অপরাধ স্বীকার করে সবার কাছে ক্ষমা চান, তাহলে বিবেচনা করে দেখব।

যে অপরাধ করি নাই সেই অপরাধ কীভাবে স্বীকার করব ?

আপনি বুরবাক। এখন বিদায় হন। বুরবাকের সাথে কথা বলতে নাই।
বুরবাকের সঙ্গে কথা বললে আয়ুক্ষয় হয়।

অনেকদিন এই অঞ্চলে আছি, একটা মায়া পড়ে গেছে।

আপনার অন্তরভর্তি মায়া। এত মায়া নিয়া এক জায়গায় থাকা ঠিক না।
বিভিন্ন জায়গায় যান। মায়া দিতে থাকেন। মায়ার চাষ করেন।

মাওলানা চলে এলেন। বাড়িতে না গিয়ে মসজিদের দিকে রওনা হলেন।
আজ সারাদিন এবাদত বন্দেগি করবেন। তাঁর ধারণা, নিজের অজান্তে তিনি
কোনো একটা অপরাধ করেছেন বলেই আল্লাহপাক তাঁকে এই শাস্তি দিচ্ছেন।
শরীরকে শুদ্ধ রাখার জন্যে কয়েকটা নফল রোজা রাখতে হবে। রোজা শরীর
শুদ্ধ রাখার মহৌষধ। শরীর শুদ্ধ হলেই মন শুদ্ধ হবে। নেয়ামত হোসেনের কথা
শুনে মন অশান্তও হয়েছে। মনকে শান্ত করতে হবে। রিজিক নিয়ে তিনি বেশি
চিন্তা করছেন আল্লাহপাকের উপর ভরসা করছেন না,— এটা একটা নাফরমানি।
তিনি যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন তাই হবে। তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তই মেনে নিতে
হবে। এর নাম ঈমান।

মসজিদের বারান্দায় সুলেমানের ছেলেটা বসে আছে। তার চোখেমুখে
দিশাহারা ভাব। দূর থেকে দেখেই মনে হচ্ছে, সে বড় কোনো সমস্যায় পড়েছে।

মাওলানা বললেন, তোর কী হয়েছে?

ছেলে জবাব দিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে বসে রইল। তার চোখমুখ
কঠিন।

মাওলানা বললেন, আমারে কিছু বলবি?

জহির উঠে চলে গেল। ছেলেটা অল্প সময়ে কয়েকটা বেআদবি করে
ফেলেছে। মুরক্বি মানুষকে দেখেও সালাম দেয় নাই। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে
উঠে চলে গেছে। মাওলানার উচিত রাগ করা, তিনি রাগ করতে পারছেন না।
মানসিক কষ্টের সময় মানুষ ভুলভ্রান্তি করে। সেই ভুলভ্রান্তি ক্ষমার চোখে
দেখতে হয়। সুলেমান দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। সেই কারণেই হয়তো ছেলেটা
কষ্টে আছে।

মাগরেব এবং এশার নামাজ শেষ করে মাওলানা বাড়ি ফিরে গেলেন। সঙ্গে
টর্চ ছিল না, তাতে সমস্যা হলো না। ফকফকা চান্নি। জঙ্গলের মাথার উপর
বিশাল চাঁদ। পূর্ণিমার রাতে জিন ভূত থাকে না। ওদের কর্মকাণ্ড অমাবশ্যায়।
চাঁদের হিসাবে তাদের চলাচল। তারপরেও মাওলানা আয়াতুল কুরসি পড়তে
পড়তে এগুচ্ছেন। বেতঝোপের পাশে তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। এই

জায়গাটা সবচে' খারাপ। এখান থেকে নদীর পাড়ের শ্মশানঘাট দেখা যায়। শ্মশানঘাটে প্রতিদিনই একটা দুটা মরা পোড়ানো হয়। মাংসপোড়া গন্ধ এবং কাঠকয়লার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে, শরীর গুলায়। আজও মরা পোড়ানো হচ্ছে। তবে মরা পোড়ানোর গন্ধ আসছে না। উত্তরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। গন্ধ ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণে।

মাওলানা বাড়ি ফিরে অবাক হলেন। উঠানে জহির বসে আছে। তার সঙ্গে টিনের ট্রাংক। সে বসে আছে ট্রাংকের উপর। তার গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। টিনের ট্রাংকটা নতুন। চাঁদের আলোতে ট্রাংক ঝলমল করেছে। মাওলানা বললেন, তোর ঘটনা কী?

জহির অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আইজ থাইক্যা আপনার লগে থাকব।

মাওলানা বললেন, তুই যে এইখানে তোর বাপ জানে?

জহির হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া হইছে?

জহির জবাব দিল না।

মাওলানা বললেন, আয় খাওয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করি। বেগুন পুড়া, ডাইল ভাত চলব?

হঁ।

ঘরে ডিমের সালুন আছে। ডিমের সালুন খাইতে চাস?

হঁ।

মাওলানা রাঁধতে বসলেন। জহির তার সামনে বসে আছে। তার বসে থাকার ভঙ্গিতেই মনে হচ্ছে সে ক্ষুধায় কাতর। রান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত গল্পগুজব করে ছেলেটাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

নতুন মা'র নাম কী?

হালিমা।

বড়ই ভালো নাম। নেক নাম। বিবি হালিমার নাম শুনছস?

না।

কস কিরে পুল্লা? বিবি হালিমা নবিজির দুধমা। হারিস হইল উনার দুধ পিতা। স্মরণে রাখিস।

হঁ।

তোর নতুন মা তোরে কষ্ট দেয় না-কি রে?

না।

মারধোর করে ?

না।

তাইলে তুই আমার কাছে থাকতে আসছস, ঘটনা কী ?

জহির জবাব দিল না। মাওলানা বললেন, আমার এই বাড়ি খারাপ। জিনের আনাগোনা। আপনাআপনি জানালা বন্ধ হয়, জানালা খুলে। গাছের ডাল নড়ে। তুই ভয়ে মইরা যাবি।

জহির মাথা নিচু করে হাসছে।

মাওলানা অবাক হয়ে বললেন, হাসছ কেন ?

জহির বলল, আপনার বাড়িত বান্দর আছে। বান্দরে ত্যক্ত করে।

তুই জানস ক্যামনে ?

আমি দেখছি। বান্দরে জানালা টানাটানি করে। দুইটা বান্দর।

মাওলানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বাড়িতে জিন ভূতের এত সহজ ব্যাখ্যা তাঁর মাথায় আসে নি।

পুলা, তোর বুদ্ধি তো ভালো।

জহির মাথা নিচু করে হাসল।

হাত-মুখ ধুইয়া আয়। খানা হইছে।

জহির অতি দ্রুত খাচ্ছে। মাওলানা খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছেন। ক্ষুধার্ত একটি শিশু আগ্রহ করে খাচ্ছে, এরচে' সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে কি আছে ?

হরিচরণের বাড়িতেও একজন খেতে বসেছেন। তিনিও খুব আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছেন। তাঁর নাম শশাংক পাল। এই অঞ্চলের প্রাক্তন জমিদার। আজ তাঁর হতদৈন্য দশা। গায়ের কাশ্মীরি শালটা অবশ্যি দামি। শালের নিচে রুপার থালা দু'টো দামি। তিনি এসেছেন থালা দু'টা হরিচরণকে দিয়ে কিছু টাকা নিতে। খুব বেশি না, পঞ্চাশটা রুপার টাকা। হরিচরণ থালা রাখেন নি, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন।

শশাংক পাল বললেন, তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়েছি। হাতি গর্তে পড়লে সবাই খারাপ ব্যবহার করে, তুমি তা করো নি। মানুষ হিসেবে তুমি উত্তম।

হরিচরণ বললেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ক্ষুধার্ত। আপনি কি আমার এখানে খানা খাবেন ?

শশাংক পাল বললেন, খাব। পোলাও খেতে ইচ্ছা করছে। পোলাও খাব।
মুরগির মাংস খাব। ঝাল দিয়ে রাঁধতে বলো। ইদানীং ঝাল ছাড়া মুখে কিছু রুচে
না। শরীর পুরোপুরি গেছে। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। একদিক দিয়ে ভালো। খাওয়া
জুটে না।

কলিকাতা চলে যান না কেন? শুনেছি সেখানে আপনার বড় বড়
আত্মীয়স্বজন আছে।

ঠিকই শুনেছ। যাই না, ওদের মুখ দেখাব কীভাবে?

আপনার যে অবস্থা, এত কিছু ভাবেন কেন?

তাও ঠিক। মুরগির মাংসের সঙ্গে ডিমের ভুনা করতে বলো। বেশি করে
পিঁয়াজ দিতে বলবে। যখন কষা কষা হবে তখন চায়ের চামচে আধা চামচ চিনি
দিবে। ত্রিপুরার মহারাজার পূণ্যার সময় একবার উনার নিমন্ত্রণে ত্রিপুরা গিয়েছি।
নীরমহলে দুইরাত থেকেছিলাম। তখন ডিমের এই রান্না খেয়েছি।

আপনার যখন ভালো কিছু খেতে ইচ্ছা করে আমাকে জানাবেন, আমি
ব্যবস্থা করব।

বললেই তো ব্যবস্থা করতে পারবে না। ময়ূরের মাংস খেতে ইচ্ছা করে।
গৌরীপুরের মহারাজার বাড়িতে খেয়েছিলাম। তিনি ময়ূর আনিয়েছিলেন
রাজস্থান থেকে। বাবুর্চিও রাজস্থান থেকে এসেছিল। ময়ূরের মাংস খেয়ে এত
আনন্দ পেয়েছিলাম যে বাবুর্চিকে বিশটা রুপার টাকা দিয়েছিলাম।

ময়ূরের মাংস খওয়াতে পারব না।

পারবা না জানি। কী আর করা। ঘটনা শুনেছ?

কী ঘটনা?

মসজিদের যে মাওলানা তার পাছায় লাথি দিয়ে তাকে অঞ্চল ছাড়ার ব্যবস্থা
করেছেন।

কে করেছেন?

তারই স্বজাতি। শাল্লার জমিদার। মাওলানা ধরা খেয়েছে তার স্বজাতির
কাছে।

আপনি মনে হয় খুশি।

শশাংক পাল হাই তুলতে তুলতে বললেন, অবশ্যই আমি খুশি। কাউকে
বিপদে পড়তে দেখলে আমার খুশি লাগে।

হরিচরণ বললেন, মাওলানা ভালো মানুষ। আমি তাকে বিপদে পড়তে দেব
না।

শশাংক পাল বললেন, একমাত্র তুমিই এখন তাকে রক্ষা করতে পারবে।
তোমার ক্ষমতা আছে। এই দুনিয়ায় ক্ষমতাই সব। জমিদারি কেমন চলছে?

ভালো। আপনার পুরনো কর্মচারীরাই কাজকর্ম দেখছে। তাদের সঙ্গে আছে
শশী মাস্টার।

শশী মাস্টার নাকি পাগল?

ভাবের মধ্যে থাকে, তবে পাগল না।

ভাবের পাগল কিন্তু বড় পাগল, এটা খেয়াল রাখবা।

আচ্ছা খেয়াল রাখব।

খাওয়া শেষ করে শশাংক পাল হরিচরণের বৈঠকখানাতে গুয়ে পড়লেন।
তাঁর হাঁপানির টান উঠেছে। এই অবস্থায় হেঁটে কোথাও যাওয়া সম্ভব না।

শশাংক পাল আধশোয়া হয়ে পালংকে বসে আছেন। তাঁর মুখভর্তি পান।
ঠোট বেয়ে পানের রস গড়াচ্ছে। এদিকে তাঁর খেয়াল নেই। হরিচরণ তাঁর
সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

শশাংক পাল বললেন, তুমি কি জোড়াসাঁকোর রবি ঠাকুরের নাম শুনেছ?
শুনেছি।

গান লেখে, গান গায়। তার গান জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শুনেছি, মধুর
গলা।

তার কথা হঠাৎ উঠল কেন?

উনি বিরাট পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কার। তার অবস্থা দেখ। আর
আমার অবস্থা দেখ। গান-কবিতা আমিও লিখতাম। ট্রাংকভর্তি লেখা ছিল।
সবই নিয়তি।

সময় ১৯১৩ সন। ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবেন এই
বিষয়ে সবাই যখন নিশ্চিত তখন হঠাৎ নোবেল কমিটি মত পাল্টালেন।
বাংলাভাষী এক কবিকে এই পুরস্কার দিয়ে দিলেন।



মোহনগঞ্জের বরান্তর গ্রামের মসজিদের ইমাম আব্দুল হক আকন্দ এসেছেন বান্ধবপুরে। যেহেতু ইমাম মানুষ, লোকজনের কাছে তাঁর পরিচয় মুনসি। মুনসি সাহেবের ডাকনাম উকিল। বাবা-মা'র আশা ছিল এই ছেলে বড় হয়ে উকিল হবে। সেই থেকে তাঁর পরিচয় উকিল মুনসি। বড়ই আশ্চর্যের কথা, মুনসি মানুষ হয়েও তিনি গানবাজনা করেন। লোকজন তাঁর গানবাজনা খুব যে মন্দ চোখে দেখে তা-না। তখনকার মুসলিম সমাজে উগ্রতা ছিল না। মসজিদের ইমাম সাহেব ঢোল বাজিয়ে গান করছেন, বিষয়টাতে অন্যায় কেউ খুঁজে পায় নি। বরং তাঁর গান লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

মাওলানা ইদরিস উকিল মুনসির আগমনের খবর পেয়ে নদীর ঘাটে গেছেন। আদর করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসবেন। উকিল মুনসি বরান্তর মসজিদের ইমাম। তিনি নিজেও ইমাম। একজন ইমাম থাকবেন আরেকজন ইমামের কাছে। এইটাই সহবত।

বড়গাঙের বাজারের ঘাটে উকিল মুনসির নৌকা বাঁধা। নৌকার ছই সবুজ শাড়ি দিয়ে ঘেরটোপ দেয়া। তার ভেতর বসে আছেন 'লাবুসের মা'।

তিনি লাবুস নামের কারো মা না। তাঁর নামই লাবুসের মা। তিনি উকিল মুনসির স্ত্রী। জনশ্রুতি— লাবুসের মায়ের মতো রূপবতী কন্যা অতীতে কখনো জন্মায় নি। ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

লাবুসের মা'র জন্ম ভাটি অঞ্চলের জালালপুরে। একবার মাত্র এই মেয়েকে চোখের দেখা দেখে উকিল মুনসি আধাপাগল হয়ে যান। প্রথম গান লেখেন—

ধনু নদীর পশ্চিম পাড়ে
সোনার জালালপুর
সেইখানে বসত করে
লাবুসের মা
উকিলের মনচোর।

মাওলানা ইদরিস নদীর পাড়ে গিয়ে দেখেন, উকিল মুনসির নৌকা ঘিরে
অনেক নৌকা। নৌকাভর্তি মানুষ। পাড়েও লোকজন দাঁড়িয়ে আছে।

উকিল মুনসি গান ধরেছেন—

আষাঢ় মাইস্যা ভাসা পানিরে
পুবালি বাতাসে
বাদাম দেইখ্যা চায়া থাকি
আমার নি কেউ আসে রে ।।

যেদিন হতে নতুন পানি
আসল বাড়ির ঘাটে
অভাগিনীর মনে কত
শত কথা উঠে রে ।।

কত আসে কত যায়
নায় নাইয়রির নৌকা
মায়ে ঝিয়ে ভইনে ভইনে
হইতেছে যে দেখা রে ।।

আমি যে ছিলাম ভাই রে
বাপের গলায় ফাঁস
আমারে যে দিয়া গেল
সীতা বনবাস রে ।।

আমারে নিল না নাইয়র
পানি থাকতে তাজা
দিনের পথ আধলে যাইতাম
রাস্তা হইত সোজা রে ।।

ভাগ্য যাহার ভালো নাইয়র
যাইবে আষাঢ় মাসে
উকিলের হইবে নাইয়র
কার্তিক মাসের শেষে রে ।।*

*উকিল মুনসির এই গান একশ' বছর পর জনৈক চলচ্চিত্রকার তাঁর ছবি 'শ্রাবণ মেঘের দিন'-এ ব্যবহার করেন।

মাওলানা ইদরিসের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। এত সুন্দর গান! এমন গলা! মাওলানা চোখের সামনে আষাঢ় মাসে নাইয়রদের নৌকার পাল দেখতে পাচ্ছেন। তিনি কয়েকবার গাঢ় স্বরে বললেন, আহা রে! আহা রে!

উকিল মুনসি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাওলানা ইদরিসের সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে রাজি হলেন। উকিল মুনসি মুখভর্তি পান নিয়ে বললেন, আমি কিন্তু তাহাজ্জুদের নামাজের শেষে গানবাজনা করি। অসুবিধা হবে?

মাওলানা বললেন, আমার বাড়ি জঙ্গলের ভেতরে। কেউ শুনবে না।

উকিল মুনসি বললেন, আমি তো গান করি সবেরে শুনানোর জন্যে। কেউ না শুনলে ফায়দা কী?

আমি শুনব। আমাদের ভাবি সাব শুনবেন।

উকিল মুনসি বললেন, সেটাও খারাপ না। অধিকে শোনার চেয়ে মন দিয়া যদি অল্পে শুনে সেটা ভালো। আপনার ভাবি সাব বিরাট রাঁধুনি। সে সবচে' ভালো রাঁধে রিঠা মাছ। রিঠা মাছ জোগাড় করেন।

যেভাবে পারি জোগাড় করব।

আপনার ভাবি সাবের রূপ বেহেশতের হর বরাবর। তাকে দেখলে বেহেশতের হর কেমন হবে এই বিষয়ে আন্দাজ পাবেন। আমি তাকে বলব, সে যেন আপনার সামনে পর্দা না করে। নবিজির স্ত্রীদের জন্যে পর্দা বাধ্যতামূলক। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের স্ত্রীদের জন্যে পর্দা বাধ্যতামূলক না।

ইদরিসের বাড়িতে পা দিয়ে উকিল মুনসি মুগ্ধ গলায় গান ধরলেন—

আমি না বুঝিয়া কার ঘরে আসিলাম

কারে করলাম আমার নাওয়ার সাথি।

উকিল মুনসির স্ত্রী তাঁর পেছনেই ঘোমটা পরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উকিল মুনসি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘোমটা খুইলা দেখ— কী সুন্দর বাড়ি! কী সুন্দর জংলা! আহারে কী সৌন্দর্য! আমি স্বপ্নে দেখেছি বেহেশত এই রকম হবে। প্রত্যেকের জন্য থাকবে বেহেশতি জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কাঠের বাড়ি। বাড়ির পাশে পানির নহর। গাছে গাছে মনোহর পাখিপাখালি।

মাওলানা ইদরিস রিঠা মাছের সন্ধানে মাছবাজারে গেলেন। আজ হাটবার। বাজারে প্রচুর মাছ থাকার কথা। রিঠা মাছ পাওয়া গেল না, তবে বড় বড় বাছা মাছ পাওয়া গেল। এই অঞ্চলের বাছা মাছ বিখ্যাত। মাছের বাজারে দেখা হলো হরিচরণের সঙ্গে। তিনি মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। তবে নিয়ম করে হাটের দিন তিনি মাছবাজারে আসেন। তাজা বড় বড় মাছ দেখতে তাঁর ভালো লাগে। জমিদার মানুষ, পাইক বরকন্দাজ নিয়ে চলাফেলা করার কথা। তিনি

চলাফেরা করেন একা। চামড়ার এক জোড়া চটি, ধুতি হাঁটু পর্যন্ত তোলা। গায়ে ঘিয়া রঙের চাদর।

হরিচরণ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গুনলাম বিখ্যাত গাতক বাউল সাধক উকিল মুনসি আপনার বাড়িতে এসেছেন ?

ইদরিস বললেন, জি এসেছেন।

কয়েক দিন কি থাকবেন ?

বলেছেন তো থাকবেন। তবে এঁরা ভাবের মানুষ। হুট করে যদি বলেন চলে যাব, তাহলে চলে যাবেন।

উনার স্বকণ্ঠে গান শোনার বাসনা ছিল। বিখ্যাত বিচ্ছেদি গান। সম্ভব কি হবে ? নিমন্ত্রণ করলে আমার বাড়িতে কি উনি যাবেন ? হাতির পিঠে করে উনাকে নিয়ে যেতাম।

বলে দেখব। নিরহঙ্কারী মানুষ। বললেই রাজি হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি উনার জন্যে একটা মাছ কিনে দেই। কী মাছ উনার পছন্দ জানেন ?

রিঠা মাছ পছন্দ। আজ বাজারে রিঠা মাছ উঠে নাই।

হরিচরণ বললেন, রিঠা মাছের ব্যবস্থা আমি করব। আজ আমার পছন্দের মাছ নিয়ে যান।

হরিচরণ বাজারের সবচে' বড় রুই মাছটা কিনলেন। প্রকাণ্ড লাল মুখের জ্যাকুট রুই। জীবনের আনন্দে ছটফট করছে। এমন এক মাছ যাকে দেখতেও আনন্দ।

ইদরিস বললেন, এত বড় মাছ কে খাবে ? মাছ কুটাও তো মুশকিল।

কোনো মুশকিল না। মাছ কুটার লোক আমি পাঠাব। মাছ কুটে দিয়ে আসবে। আস্ত মাছ দেখে উকিল মুনসি সাহেব হয়তো খুশি হবেন। বড় মাছ দেখে খুশি হয় না এমন মানুষ কম। আপনি নিয়ে যান।

উকিল মুনসি মাছ দেখে মুগ্ধ। তিনি নিজেই মাছ কুটতে বসলেন।

ইদরিস বললেন, আপনার জন্যে মাছটা হরিচরণ বাবু পাঠিয়েছেন। অতি বিশিষ্ট মানুষ। লোকে তাঁর নাম দিয়েছে ঋষি হরিচরণ।

উকিল মুনসি বললেন, মানুষের মুখে জয়, মানুষের মুখে ক্ষয়। অনেক মানুষ যাকে জয় বলে, তার অবশ্যই জয়। এত বড় মাছ উনি পাঠিয়েছেন। তাঁকে দাওয়াত দেন। তাঁর সঙ্গে খাই।

উনি মাছ-মাংস খান না। নিরামিষ আহার করেন।

ভালো, খুবই ভালো।

উনার খুব ইচ্ছা স্বকণ্ঠে আপনার বিচ্ছেদ গান শুনেন। আপনি রাজি হলে
আপনার জন্যে হাতি পাঠিয়ে দিবেন।

উনার হাতি আছে না-কি ?

জি আছে। শশাংক পালের সাত আনি জমিদারি খরিদ করেছেন।

সইক্যাকালে উনারে হাতি পাঠাইতে বলেন। লাবুসের মা'রে নিয়া হাতির
পিঠে চড়ব। এই বলেই উকিল মুনসি গান ধরলেন— মাছ কুটতে কুটতে গান।
বারান্দায় ঘোমটা দেয়া লাবুসের মা হাসছেন। স্বামীর আনন্দ দেখে উনি
আনন্দিত।

উকিল মুনসি হাতির পিঠে

লইড়া চইরা বসে।

সেই হাতি কদম ফেলে

লিলুয়া বাতাসে

ঘোমটা পরা লাবুসের মা

ঘোমটার ফাঁকে চায়

তাহারে পাগল করছে

উকিলের মায়ায়॥

লাবুসের মা'র সঙ্গে মাওলানা ইদরিসের কথাবার্তা হলো। মাওলানা কখনোই
সরাসরি তাকালেন না। যে-কোনো তরুণীর দিকে দৃষ্টি ফেলা অপরাধ। অথচ
লাবুসের মা'র মধ্যে কোনো সঙ্কোচ নেই। যেন মাওলানা তাঁর অনেক দিনের
চেনা।

লাবুসের মা বললেন, আমার সাথে ধর্মের ভইন পাতাইবেন। ও মাওলানা,
আমার দিকে চায়া কথা বলেন। ভাই ভইনের দিকে তাকাইতে পারে।

আপন ভাই ভইনের দিকে তাকাতে পারে।

আপন ভাবলেই আপন। আপন ভাইব্যা আমার সঙ্গে কথা বলেন।

কী কথা বলব ?

বয়স হইছে, শাদি করেন না কেন ? আপনে মাওলানা মানুষ, শাদি যে
ফরজ এইটা জানেন না ?

জানি।

কইন্যা দেখব ? আমার সন্ধানে ভালো পাত্রী আছে। ওমা, মাওলানা দেখি
লইজ্যা পায়। নাক-মুখ হইছে লাল।

উকিল মুনসি এসেছেন হরিচরণের বাড়িতে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।
মাওলানা ইদরিস আসেন নি।

লাবুসের মা স্বামীর সঙ্গে এলেও হরিচরণের বাড়িতে ঢুকে আলাদা হয়ে
পড়েছেন। পুরুষদের গানের আসরে তিনি কখনো থাকেন না। লাবুসের মা
হরিচরণের বাড়িঘর ঘুরে ঘুরে দেখছেন। বাগান দেখছেন। দিঘি দেখছেন।

হরিচরণ দামি কার্পেটে উকিল মুনসিকে বসতে দিয়েছেন। রুপার
পানদানিতে পান দেয়া হয়েছে। হুঁকো প্রস্তুত। আশ্রী তামাকের সুগন্ধ বাতাসে।
হুঁকোর নল হাতে অপেক্ষা করছে জহির। সে মাওলানার বাড়ি ছেড়ে হরিচরণের
বাড়িতে চলে এসেছে। কোথাও থিতু হতে পারছে না।

উকিল মুনসি বললেন, এই ছেলে কে ?

হরিচরণ বললেন, এর নাম জহির। আমার এখানে থাকে।

মুসলমান ছেলে ?

জি।

অতি লাবণ্যময় চেহারা। সে কি ঘাটুগানের ছেলে ?

হরিচরণ বললেন, না। সে আমার পুত্রসম।

উকিল মুনসি বললেন, গোস্ঠাকি মাপ হয়। আমি খারাপ কিছু ভেবেছিলেম।
বড় মানুষদের এইসব দোষ থাকে। আমি কিশোর বয়সে ঘাটুর দলে ছিলাম।
গানবাজনা সেখানে শিখেছি। শৌখিনদার মানুষ ঘাটুছেলে কীভাবে ব্যবহার করে
আমি জানি। যাই হোক, আপনি কি গান শুনবেন ?

বিচ্ছেদের গান শুনতে আমার আগ্রহ, তবে আপনি আপনার পছন্দের গান
করেন।

উকিল মুনসি বললেন, আমারও পছন্দ বিচ্ছেদের গান। কী জন্যে জানেন ?

হরিচরণ বললেন, জানি না কী জন্যে ?

উকিল মুনসি বললেন, আল্লাহ বা ভগবান যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক,
তিনি থাকেন বিচ্ছেদে।

সুন্দর কথা!

উকিল মুনসি ঢোলে বাড়ি দিয়ে গান ধরলেন। তিনি এক পায়ে নূপুর
পরেছেন। গানের সঙ্গে নূপুর বাজছে। নূপুরের শব্দ করুণ রস তৈরি করে না,
কিন্তু এখন করল। হরিচরণের চোখ ছলছল করতে লাগল।

উকিল মুনসি গাইছেন—

সোনা বন্ধুয়া রে ।

এত দুঃখু দিলি তুই আমারে

তোর কারণে লোকের নিন্দন, করেছি অঙ্গের বসন রে ।

কুমারিয়ার ঘটিবাটি, কুমার করে পরিপাটি

মাটি দিয়া লেপ দেয় উপরে ।

ভিতরে আগুন দিয়া, কুমার থাকে লুকাইয়া

তেমনি দশা করলি তুই আমারে ।

উকিল মুনসি গান শেষ করলেন । হরিচরণ চোখ মুছতে মুছতে বললেন,
আরেকটা গান ।

উকিল মুনসি বললেন, নিজের গান না । আমার শিষ্যের লেখা একটা গান
করি । তার সমস্ত গানই কাটা বিচ্ছেদ । গান শুনলে কলিজা কাইটা যায়— এই
জন্যেই এর নাম কাটা বিচ্ছেদ । শিষ্যের কাছে পরাজিত হওয়ায় আনন্দ আছে ।
আনন্দের জন্যে গানটা করব ।

অবশ্যই করবেন ।

আমার শিষ্যের নাম সিরাজ আলি । তার বাড়ি আটপাড়া ।

উকিল মুনসি গান ধরলেন—

সোনা বন্ধুরে

অপরাধী হইলেও আমি তোর

আমি তোর পিরিতের মরা

দেখলি না এক নজর ।

অপরাধী হইলেও আমি তোর ।

অনেক রাতে গানবাজনা শেষ হলো । হরিচরণ বিনীত ভঙ্গিতে হাতজোড়
করে বললেন, আপনার কোনো সেবা করতে পারি ? এই সৌভাগ্য কি আমার
হবে ?

সেবা করতে চান ?

চাই । অন্তর থেকে চাই ।

আমি আপনাদের অঞ্চলে ঘুরতে আসি নাই । বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছি । যে
উদ্দেশ্যে এসেছি মাওলানা ইদরিস তার কিছু করতে পারবে না । সে কঠিন
মাওলানা ।

হরিচরণ বললেন, কী উদ্দেশ্য বলেন। আমি ব্যবস্থা করব।

উকিল মুনসি বললেন, আমি শুনেছি আপনাদের রঙিলা বাড়িতে এক রঙিলা মেয়ে আছে, যার রূপ দেখে বেহেশতের হররা লজ্জা পায়। তাকে এক নজর দেখব। সে কী লাবুসের মায়ের চেয়ে সুন্দর কি-না তার পরীক্ষা হওয়া দরকার। শুনেছি তার কণ্ঠ কোকিল পক্ষীর কণ্ঠের চেয়েও মধুর। সে না-কি উকিল মুনসির গান ছাড়া অন্য গান করে না। তার কণ্ঠে আমার একটা গান শুনব।

হরিচরণ বললেন, ব্যবস্থা করে দেব। এই মেয়ের কথা কার কাছে শুনেছেন?

অনেকের কাছেই শুনেছি। মানুষের গুণ বাতাসের আগে যায়।

আর দোষ? দোষ কীভাবে যায়?

দোষ চলে না জনাব। দোষ থাকে নিজের অঞ্চলে। দোষের পা নাই। সে ছুটতে পারে না।

উঠানে হাতি প্রস্তুত। উকিল মুনসি স্ত্রীকে নিয়ে হাতিতে ফিরবেন। ঘোমটা পরা লাবুসের মা হরিচরণের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, আপনি দরিদ্র এক বাউলকে যে সম্মান করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহপাক আপনাকে আরো সম্মান দেবেন।

হরিচরণ বললেন, মাগো, আমি সম্মানের কাঙাল না। তারপরেও আপনার সুন্দর কথায় খুশি হয়েছি।

আপনি আমাকে মা ডাকলেন। সব মেয়েকেই কি আপনি মা ডাকেন?

হরিচরণ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। লাবুসের মা বললেন, আমি আপনার দিঘির ঘাটলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখি শিউলি গাছের নিচে অল্পবয়সি বাঁচ্চা একটা মেয়ে হাঁটাহাঁটি করতেছে। গোল মুখ, কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটা কে?

হতভম্ব হরিচরণ কোনো জবাব দিলেন না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। লাবুসের মা বললেন, আপনার কোনো কন্যা কি অল্পবয়সে মারা গিয়েছিল?

হরিচরণ বললেন, হ্যাঁ।

লাবুসের মা হতাশ গলায় বললেন, আমি মৃত মানুষজন মাঝে মাঝে দেখতে পারি। কেন যে পারি নিজেও জানি না।

লাবুসের মা হাতির দিকে রওনা হলেন।

জুলেখার ঘরে অতিথি এসেছে। আলাভোলা চেহারা, গায়ে চাদর। পরনে লুঙ্গি। রঙিলা বাড়িতে লুঙ্গি পরে কেউ আসে না। বাবু সেজে আসে। কানের লতিতে আতর দেয়।

অতিথি বললেন, আপনার নাম কী ?

জুলেখা বলল, সবার প্রথম প্রশ্ন আপনার নাম ? নামের কি প্রয়োজন ? আমার নাম ফুলবিবি হলেও যা চানবিবি হলেও তা, আবার জুলেখা হলেও ক্ষতি নাই। মনে করেন আমার নাম জুলেখা। পান খাবেন ? ভালো জর্দা আছে। ময়মনসিংহের সাধুবাবা জর্দা।

পান খাব।

জুলেখা পানদান এবং পিক ফেলার পিকদান পাশে এনে রাখল। পিকদান পিতলের। কিছুদিন হলো কিনেছে। রোজ তেঁতুল দিয়ে মাজা হয় বলে ঝকঝক করে। জুলেখার কাছে মনে হয় ‘সন্নের’ পিকদান।

অতিথি বললেন, জুলেখা, শুনেছি তোমার কণ্ঠস্বর মধুর। আমি দূরদেশ থেকে এসেছি তোমার গান শুনতে। বাদ্যবাজনার প্রয়োজন নাই। খালি গলায় গান করবে, আমি শুনব।

জুলেখা পান সাজতে সাজতে বলল, আমার গানের কথা শুনেছেন। রূপের কথা শুনে নাই ?

রূপের কথাও শুনেছি। স্বীকার পাইলাম তোমার রূপ আছে। শোনা কথা বেশির ভাগ সময় মিলে না। তোমার বেলায় মিলেছে।

জুলেখা অতিথিকে এক খিলি পান দিয়ে নিজে এক খিলি পান মুখে নিল। তার পানে খয়ের বেশি করে দেয়া, যাতে কিছুক্ষণের মধ্যে ঠোঁট টকটকে লাল হয়ে যায়। সে পান চাবাতে চাবাতে বলল, কী গান শুনবেন ?

তুমি উকিল মুনসির গান ভালো জানো বলে শুনেছি। তাঁর একটা গান শোনাও।

তাঁর গান আইজ গাব না। অন্য গান শুনেন।

তাঁর গান গাবা না কেন ?

যেদিন আমার মন ভালো থাকে না, সেইদিন উনার গান করি। আইজ আমার মন ভালো।

আমি তোমার কাছে উকিল মুনসির গান শুনতে আসছি। অন্য গান না।

টাকা কত এনেছেন ?

বিশটা রূপার টাকা এনেছি। চলবে ?

হ্যাঁ, চলবে।

জুলেখা পিকদানে চাবানো পান ফেলে ঠোট মুছেই গান ধরল—

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়
নিঠুর বন্ধুরে
বিচ্ছেদের বাজারে গিয়া
তোমার প্রেম বিকি দিয়া
করব না প্রেম আর যদি কেউ কয়।

জুলেখার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। চোখের কাজল পানিতে ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। তার ফর্সা মুখে তৈরি হচ্ছে কালো রেখার আঁকিবুকি।

গান শেষ করে জুলেখা বলল, আরো কি গাইব ?

অতিথি বললেন, বিশটা রূপার টাকায় যে কয়টা হয় সেই কয়টা গান শোনাও।

জুলেখা বলল, উকিল মুনসির একটা গানের দাম এক কলসি সোনার মোহর।

অতিথির ঠোটের কোনায় সামান্য হাসির আভাস দেখা গেল। তিনি দ্রুত সেই হাসি মুছে ফেলে বললেন, তোমার ঘরে ঢোল তবলা কিছু থাকলে আমারে দাও, গানের সাথে তাল দেই। তাল বিনা গান গাইতে তোমার অসুবিধা হইতেছে। আচ্ছা থাক, লাগবে না।

অতিথি পিকদান কাছে টেনে নিলেন। হাতের বাড়িতে পিকদান থেকে সুন্দর ধাতব শব্দ হলো।

জুলেখা হাসিমুখে বলল, আপনি তো বিরাট উনসুনি লোক (উনসুনি : সূক্ষ্ম কলাকৌশলে ওস্তাদ ব্যক্তি)। উকিল মুনসির গান পিয়ার করেন ?

হুঁ।

জুলেখা দ্বিতীয় গান ধরল—

রজনী প্রভাত হলো ডাকে কোকিলা
কার কুঞ্জে ভুলিয়া ভুলিয়া...

অতিথি বললেন, ভুলিয়া ভুলিয়া হবে না। হবে ভুলিয়া রহিলা।

রজনী প্রভাত হলো ডাকে কোকিলা
কার কুঞ্জে ভুলিয়া রহিলা।

জুলেখা বলল, আপনার পরিচয় কী ?

অতিথি বললেন, আমার নাম উকিল মুনসি ।

ঘরে যেন বজ্রাঘাত হলো । কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে হিন্দুদের প্রণামের ভঙ্গিতে জুলেখা উকিল মুনসির পায়ে মাথা রাখল । তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে । চাপা ফোঁপানির শব্দ আসছে ।

উকিল মুনসি বললেন, তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি । আমি তোমাকে দোয়া দিলাম ।

জুলেখা বলল, কী দোয়া দিলেন ?

সব কিছু তোমাকে ছেড়ে গেলেও গান কোনোদিন ছেড়ে যাবে না । পা থেকে মাথা সরাও, আমি এখন উঠব । ঘাটে নাও নিয়া আমি আসছি । নাও-এ আমার স্ত্রী অপেক্ষা করতেছেন । আমাকে বেশিক্ষণ না দেখলে তিনি অস্থির বোধ করেন ।

জুলেখা বলল, আমার মাথা সরাব না । আপনার যদি যেতে হয় পাও দিয়া আমার মাথায় লাথ দিবেন । মাথা সরবে । তারপর আপনি যাবেন ।

উকিল মুনসি কী করবেন বুঝতে পারছেন না । মেয়েটা এখন ঘোরের মধ্যে আছে । তাকে উঠে বসানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন । ঘোরের মধ্যে যে আছে তার ঘোর ভাঙানো কঠিন । ঘোরের বিষয়টা তিনি জানেন ।

জুলেখা!

জি ।

আরো কয়েকটা গান করো শুনি ।

জুলেখা উঠে বসতে বসতে বলল, আমি সারারাত গান করব । অল্প নাচ শিখেছি, যদি বলেন নাচ দেখাব ।

নাচের প্রয়োজন নাই । গান করো । ঘাটুগান জানো ? ঘাটুগানের সুর অতি মনোহর ।

আপনার সামনে আমি আপনার গান করব । অন্য কোনো গান না । জুলেখা গানে টান দিল ।

লাবুসের মা নৌকায় অপেক্ষা করছেন । তিনি একা না । নৌকার দু'জন মাঝি ছাড়াও জহির নামের ছেলেটা সঙ্গে আছে । এই ছেলের চেহারা দেবদূতের মতো । অতি রূপবতীদের যেমন বিপদ, অতি রূপবান বালকের তেমন বিপদ । ছেলেটির জন্যে তিনি মমতা বোধ করছেন । লাবুসের মা'র হাতে তসবি । তিনি তসবি টানতে টানতে নিচু গলায় ছেলেটির সঙ্গে গল্প করছেন ।

বাংলা পড়তে শিখেছ ?

জি ।

আলহামদুলিল্লাহ । হাতের লেখা সুন্দর আছে ?

হাতের লেখা সুন্দর ।

আলহামদুলিল্লাহ । পিতামাতা জীবিত ?

হঁ ।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ । তোমার উপরে আল্লাহপাকের খাস রহমত আছে ।

জহির স্পষ্ট গলায় বলল, রহমত নাই ।

লাবুসের মা'র হাতের তসবি থেমে গেল । তিনি চমকে তাকালেন । পুতুলের মতো ছেলেটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে । তিনি বললেন, কেউ যদি বলে আমার উপরে আল্লাহর রহমত নাই, তাহলে সে নাফরমানি করে । এই কাজ আর করবা না । বলো, আল্লাহপাক আমাকে ক্ষমা করো ।

বলব না ।

লাবুসের মা বড়ই অবাক হলেন । ছেলেকে দেখে মনে হয় নরমসরম কিন্তু কথাবার্তায় কাঠিন্য আছে । বাঁশ নুয়ে পড়ে । এই ছেলে কঞ্চির মতো সোজা । লাবুসের মা বললেন, তুমি অন্যদিকে তাকায়ে আছ কেন ? আমার দিকে তাকাও । আসো আমরা গল্প করি ।

জহির ফিরে তাকাল । লাবুসের মা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলেন, ছেলেটার চোখ ভেজা । তিনি বললেন, আমার নাম লাবুসের মা । আমার যখন দুই বছর বয়স তখন থাইকা আমি লাবুসের মা । অথচ আমার কোনো সন্তানাদি নাই । কোনোদিন হইব তারো ঠিক নাই । তারপরও সবার মুখে লাবুসের মা । মজা না ?

জহির হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল । মাথা নাড়ার ফাঁকে চট করে চোখের পানি মুছে নিল ।

তোমাকে এখন যদি আমি লাবুস নাম দেই, কেমন হয় ?

জহির ফিক করে হেসে ফেলল । লাবুসের মা বললেন, আইজ থাইকা তোমার নাম লাবুস । ওই পুলা, লাবুস !

জহির হাসি চাপতে চাপতে বলল, জি ।

জি কিরে পুলা ? আমি লাবুসের মা । তুই আমারে মা ডাকবি না ? বল জি মা ।

লইজ্যা লাগে ।

মা'র কাছে পুলার কী লইজ্যা ? ও লাবুইচ্যা !

কী মা ?

তুই যাবি আমার লগে ?

যাব ।

সত্যি যাবি ?

হুঁ যাব ।

বল—

উপরে আল্লা নিচে মাটি

যে কসম কাটছি সেই কসম খাটি ।

জহির বলল—

উপরে আল্লা নিচে মাটি

যে কসম কাটছি সেই কসম খাটি ।

উকিল মুনসি যে রাতে জহিরকে নিয়ে রওনা হলেন, সেই রাতে বান্ধবপুরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। জহিরের বাবা সুলেমান তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিল। এই স্ত্রীর নাম হালিমা। সে মোটাসোটা অল্পবুদ্ধির হাসি-খুশি মেয়ে। তার জীবনের একটাই শখ— সারাদিন পান চিবানো। পান খাওয়ার মতো অতি তুচ্ছ ঘটনাই তালাকের কারণ। সুলেমান বলেছিল— তুই কি ঘোড়া ? সারাদিন জাবর কাটস ? পান খাইয়া আমার সংসার ডুবাইছস। আমারে পথের ফকির করছস।

সুলেমানের কথায় অতি বিস্মিত হয়ে হালিমা বলেছিল, পান তো আপনার পয়সায় খাই না। পান আর গুয়া আমার বাপের বাড়ি থাইক্যা আসে।

এই অপমানসূচক কথায় সুলেমানের মাথায় আগুন ধরে যায়। সে বলে, কী এত বড় কথা! বাপের বাড়ির খোঁটা ? যা, বাপের বাড়িতে গিয়া পান খাইতে থাক, তোরে তালাক দিলাম। আইন তালাক, বাইন তালাক, গাইন তালাক। তিন তালাক। তুই তোর বান্দি বেটি নিয়া বিদায় হ।

তিন তালাকের পর আর এই বাড়িতে থাকা যায় না। যে কিছুক্ষণ আগেও স্বামী ছিল, তার মুখ দর্শনও করা যায় না। সে এখন পরপুরুষ। হালিমা কাঁদতে কাঁদতে শাড়ির আঁচলে লম্বা ঘোমটা দিয়ে বলল— হোসনার গর্ভ হয়েছে। সে কী করব ? (হোসনা, হালিমার দাসী। সে-সময় স্বামী কর্তৃক দাসীদের গর্ভসঞ্চারণ স্বীকৃত ছিল।)

সুলেমান বলল, সন্তান হোক। সন্তান হইলে সন্তান নিয়া আসব। হোসনা থাকবে তোর সাথে। সে তোর বান্দি। আমার না।

হালিমা কাঁদতে কাঁদতে দাসীকে নিয়ে নৌকায় উঠল।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা ঘটল ধনু শেখের বাড়িতে। ধনু শেখ তার বাড়িতে লাখের বাতি জ্বালালো। তখনকার নিয়মে নব্যধনীদেব সঞ্চিত অর্থ এক লক্ষ অতিক্রম করলে সবাইকে তা জানানোর নিয়ম ছিল। এই জানান দেয়া হতো লাখের বাতি জ্বালিয়ে এবং বাড়িতে ঘাটুগানের আয়োজন করে। যে মানুষটি লাখের বাতি জ্বালিয়েছে, তাকে সমীহ করা দস্তুর ছিল।

ধনু শেখের বাড়ির উঠানে লম্বা বাঁশ টানিয়ে বাঁশের মাথায় হারিকেন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচুর লোকজন এসেছে। তাদের জন্যে মিষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে। ঘাটুগান শুরু হয়েছে। এই গান সারারাত চলবে। সূর্য উঠার পর গান বন্ধ। তখন শিল্পির ব্যবস্থা। শিল্পি হচ্ছে খাসির মাংস এবং খিচুড়ি। লাখপতির উৎসবের জন্যে চারটা খাসি জবেহ হয়েছে।

ঘাটুগানের অধিকারী তিনটি ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। তিনজনই রূপবান। এরা মেয়েদের ফ্রক পরে মেয়ে সেজেছে। পায়ে নূপুর পরেছে। অধিকারীর ইশারায় গান শুরু হলো। একজন মঞ্চে এসে নারিকেলের মালার বুক চেপে ধরে গান ধরল—

আমার মধু যৌবন কে করিবে পান ?

দোহার এবং বাদ্যযন্ত্রীরা বিপুল উৎসাহে বাজনা বাজাতে বাজাতে দোহার ধরল—

কে করিবে পান গো ?

কে করিবে পান ?

ধনুর একমাত্র স্ত্রী কমলা, চিকের পর্দার আড়াল থেকে ঘাটু নাচ দেখছে। তার বুক কাঁপছে। কেন জানি মনে হচ্ছে এই ছেলেটাকে তার স্বামী রেখে দিবে। পালঙ্কে এখন সে আর তার স্বামী শুবে না। তাদের মাঝখানে ঘাটুছেলেটা শুয়ে থাকবে। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

ঘাটুছেলেটা যখন নাচছে তখন ঠিক তার বয়সি একজন আসানসোলের এক রুটির দোকানে লেটো নাচের কাহিনী এবং গান লিখছে। আশ্চর্য কাণ্ড! গানে সুরও দিচ্ছে। (ঘাটু এবং লেটো নাচের মধ্যে পার্থক্য তেমন নেই। লেখক)। তার বয়স এগারো। রুটির দোকানে তার মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। কিশোরের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। ডাকনাম দুখু মিয়া। কারণ দুগুখে দুগুখেই তার জীবন কাটছে।



বান্ধবপুরের পশ্চিমে মাধাই খালের দু'পাশে পাঁচমিশালি গাছের ঘন জঙ্গল। বাঁশঝাড়, ডেউয়া, বেতঝোপ, ভূতের নিবাস ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছ। জায়গায় জায়গায় বুনো কাঁঠাল গাছ—যে গাছ কখনো ফল দেয় না। এমনই এক কাঁঠাল গাছের নিচে আজ ভোর রাতে একটা বকনা গরু জবাই হয়েছে। জবাই করেছেন মাওলানা ইদরিস। ধনু শেখের মানতের গরু। ধনু শেখকে গতবছর কলেরায় ধরেছিল। জীবন যায় যায় অবস্থায় তিনি মানত করেন—যদি এই দফায় প্রাণে বাঁচেন তাহলে গরু শিনি দেবেন।

গরুর শিনির কঠিন বিষয় জঙ্গলের ভেতর করতে হয়েছে। ধনু শেখ বাড়ির দু'জন কামলা এবং তার ছোটভাইকে নিয়ে এসেছেন। গরু জবাইয়ের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। চামড়া হাড়গোড় গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে। শিনির মাংস সবাইকে ভাগ করে দেয়া নিয়ম। ধনু শেখ নিজে এই কাজটি করছেন। মুসলমান ঘর হিসাব করে করে মাংস ভাগ করছেন। পদ্মপাতায় মাংস পুঁটলি করা হচ্ছে। দিনের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি মাংস পৌঁছে যাবে।

মাওলানা ইদরিস একটু দূরে বসেছেন। তাঁকে সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে। গোপনে গরু জবেহ করার খবর চাপা থাকবে তার এরকম মনে হচ্ছে না। সামনে মহাবিপদ।

ধনু শেখ বললেন, মাওলানা, আপনারে দুই ভাগ দেই ?

মাওলানা বললেন, প্রয়োজন নাই। এক ভাগ দিলেই চলবে। আমি একজন মোটে মানুষ।

ঘরে তেল আছে তো ? গরুর মাংসের সোয়াদ তেলে। অর্ধেক মাংস অর্ধেক তেল, যতটুকু মাংস ততটুকু পেঁয়াজ। পেঁয়াজের অর্ধেক আদা। অল্প আঁচে দুপুরে বসাবেন সন্ধ্যারাত্রে নামাবেন—অমৃত।

ধনু শেখের এক কামলা বলল, অন্য মশলাপাতি লাগবে না ?

ধনু শেখ বললেন, মশলাপাতি থাকলে দিবা, না থাকলে দিবা না। ইলিশ মাছে যেমন মশলা লাগে না, গরুর মাংসেও লাগে না। একটু লবণের ছিটা, একটু কাঁচামরিচ, ইলিশ মাছের জন্যে এই যথেষ্ট। রুই মাছের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। পাকের নানান হিসাব।

রান্নাবান্নার গল্প শুনতে মাওলানার মোটেই ভালো লাগছিল না। ধনু শেখ এত অগ্রহ করে রান্নার গল্প করছে, কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলে তিনি বললেন, রুই মাছের হিসাবটা কী ?

ধনু শেখ বললেন, রুই মাছ তরিবত করে রাঁধতে হয়। কথায় আছে—

অরাধুণীর হাতে পড়ে রুই মাছ কাঁদে
না জানি রাঁধুণী মোরে কেমন করে রাঁধে।

মাওলানা নিম্পৃহ গলায় বললেন, ও আচ্ছা।

ধনু শেখ বললেন, আপনি কি চিন্তাযুক্ত ?

মাওলানা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

ধনু শেখ বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, কোনো চিন্তা করবেন না। কেউ কিছু জানবে না। আর জানলেও অসুবিধা নাই। ব্যবস্থা নেয়া আছে।

কী ব্যবস্থা ?

সেটা আপনার না জানলেও চলবে। সবার সবকিছু জানতে নাই। আপনি মাওলানা মানুষ। হাদিস কোরান নিয়া থাকবেন। যার যে কর্ম সে সেই কর্ম নিয়া থাকবে।

ধনু শেখের চেহারা আনন্দে ঝলমল করছে। ছোটখাটো মানুষ। লাখের বাতি জ্বালাবার পর থেকে ছোটখাটো মানুষটাকেই বড় লাগছে। যেন মানুষটা এখন বিশেষ কেউ। তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।

মাওলানা, দেশের খবর কিছু রাখেন ?

দেশের কী খবর ?

স্বরাজের খবর। স্বরাজ শুরু হইছে।

সেইটা কী ?

স্বাধীন হওয়ার জন্যে মারামারি কাটাকাটি। হেন্দুরা এরে বোমা মারতেছে ওরে বোমা মারতেছে।

ক্ষুদিরামের কথা শুনেছি।

ধনু শেখ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বোকার দল স্বরাজ কইরা মরুক,
আমরা এর মধ্যে নাই।

মাওলানা বললেন, আমরা নাই কেন ?

ধনু শেখ গলা নামিয়ে বললেন, দেশ তো মুসলমানের। দিল্লির সিংহাসনে
কি কোনো হেন্দু ছিল ? ছিলাম আমরা। হেন্দুরা দেশ স্বাধীন কইরা দিব। আমরা
গদিতে বসব। এরার চোখের সামনে গরু কাইটো খাব। হেন্দুরাও পেসাদ পাইব।
হা হা হা।

জঙ্গল থেকে তারা বের হলো দুপুরের আগে আগে। ধনু শেখ পদ্মপাতায়
মোড়া মাংসের ঝাঁকা এবং দলবল নিয়ে মাধাই খালে এসে নৌকায় উঠল।
নৌকা সরাসরি ধনু শেখের বাড়ির পেছনে থামল। ধনু শেখ নিজ বাড়িতে
ছেলের আকিকা উপলক্ষে দু'টা খাসি জবেহের ব্যবস্থা করেছেন। খাসি জবেহতে
কোনো বাধা নেই। এই কাজ প্রকাশ্যে করা যায়।

ধনু শেখ খাসির মাংসের সঙ্গে সব মুসলমান বাড়িতে এক পোঁটলা গরুর
মাংসও দিয়ে দিলেন। হতদরিদ্ররা যেন মাংস ঠিকমতো রাখতে পারে তার জন্যে
তেলমসলা কেনা বাবদ একটা করে আধুলি পেল। বাড়িতে বাড়িতে মাংস রান্না
হবে। গন্ধ ছড়াবে। কারোর কিছু বলার নেই। খাসির মাংস রান্না হচ্ছে।

এক পোঁটলা মাংস গেল অম্বিকা ভট্টাচার্যের কাছে। ধনু শেখ নিজেই নিয়ে
গেলেন। অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ঠাকুর! আমার ছেলের আকিকার খাসির
মাংস। আত্মীয় বান্ধবদের বাড়িতে এই মাংস বিলি করার বিধান আছে। এই
মাংস আপনি কি গ্রহণ করবেন ?

অম্বিকা ভট্টাচার্য বললেন, খাসির মাংসে কোনো দোষ নাই। তবে
মুসলমানের বাড়ির মাংস বিধায় শোধন করে নিতে হবে। শোধন করার খরচা
যদি দাও মাংস নিতে পারি।

খরচা কত ?

এক টাকার কমে হবে না। কর্পূর লাগবে। একশ' বছরের পুরনো ঘিতে
কর্পূর দিতে হবে। সেই ঘি পুড়িয়ে তার ধোঁয়া মাংসের গায়ে লাগাতে হবে।
বিরিট ঝামেলা।

ধনু শেখ এক টাকার জায়গায় দু'টাকা দিলেন। মাংস শোধন বাবদ এক
টাকা। তেল এবং মশলাপাতি কেনা বাবদ এক টাকা।

ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্য পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দ করে সেই রাতে
গরুর মাংস খেলেন।

ধনু শেখ যাবেন নটিবাড়িতে। সপ্তাহে একদিন (মঙ্গলবার) তিনি নটিবাড়িতে রাত্রিযাপন করেন। আজ মঙ্গলবার। চাদরে আতর মাখিয়ে পাশ্পশু পায়ে রঙনা হয়েছেন, পথে ঠাকুর অধিকা ভট্টাচার্যের বাড়িতে থামলেন। বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন, পুত্রের আকিকার মাংস ঠাকুর খেয়েছেন কি-না।

অধিকা ভট্টাচার্য বললেন, সবাইকে নিয়ে খেয়েছি। তৃপ্তি করে খেয়েছি।

ধনু শেখ বললেন, শুনে খুশি হলাম। তবে ঠাকুর একটা বিষয়। মাংসটা গরুর। ভুলক্রমে খাসির মাংস ভেবে আপনাকে গরুর মাংস দিয়েছি। গোপনে একটা গরু জবেহ করেছিলাম। সেই গরুর মাংস।

হতভম্ব অধিকা ভট্টাচার্য বললেন, কী বললা ?

ধনু শেখ বললেন, যা বলেছি সত্য বলেছি। তবে আপনার চিন্তার কিছু নাই। কেউ জানবে না।

অধিকা ভট্টাচার্য বিড়বিড় করে বললেন, কেউ জানুক বা না-জানুক, জাত তো চলে গেছে।

ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, জাত চলে গেলেও চূপ করে থাকেন। আপনার কন্যা আছে। তার বিবাহ দিতে হবে না ? ঠাকুর, যাই।

অধিকা ভট্টাচার্য ঘোর লাগা মানুষের গলায় বললেন, কোথায় যাও ?

ধনু শেখ বললেন, আজ মঙ্গলবার। নটিবাড়িতে যাই। মঙ্গলবার রাতটা আমি নটিবাড়িতে কাটাই। জানেন নিশ্চয়ই ?

অধিকা ভট্টাচার্য কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, এইটা তুমি কী করলা ?

ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, আপনাদের এমন কিছু কি আছে যা খেলে মুসলমানের জাত যাবে ? থাকলে দেন খাই। সমানে সমান হবে।

ঠাকুর অধিকা ভট্টাচার্যের সপরিবারে গো-মাংস ভক্ষণ কাহিনী তৃতীয় দিনের দিন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বিধান দেবার জন্যে শ্যামগঞ্জ থেকে ন্যায়রত্ন রামনিধি চলে এলেন। তিনি বললেন, গরু যদি অল্পবয়স্ক হয় তাহলে জাত যাবে না। প্রায়শ্চিত্ত করলেই হবে। কারণ পার্বতীর পিতা, শিবের স্বপুত্র মহারাজা দক্ষ যে যজ্ঞ করেছিলেন সেখানে গোবৎস বধ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণরা গোবৎসের মাংস খেয়েছেন।

জানা গেল ঠাকুর অধিকা ভট্টাচার্য যে মাংস খেয়েছেন তা বয়স্ক গরুর মাংস।

ন্যায়রত্ন রামনিধি বললেন, এরও বিধান আছে। যে পরিমাণ গো-মাংস প্রত্যেকে খেয়েছে সেই পরিমাণ কাঁচা গোবর এক সপ্তাহ খাবে। তাতে শরীর শোধন হবে। শরীর শোধিত হবার পর গঙ্গায় একটা ডুব দিলে গো-মাংস ভক্ষণজনিত বিষ শরীর থেকে চলে যাবে।

ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্য শরীর শোধনের প্রাথমিক পরীক্ষায় ফেল করলেন। এক চামচ গোবর মুখে দিয়ে বমি করতে করতে মৃতপ্রায় হলেন। সপরিবারে মুসলমান হবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এক শুক্রবার জুমা নামাজের পর তিনি মাওলানা ইদরিসের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেন। সবাই মুখে তিনবার বললেন—

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই।

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

মুহাম্মদ তাঁর রসুল।

মাওলানা ইদরিস প্রত্যেকের ডান কানে তিনবার করে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে ফুঁ দিয়ে দিলেন। ফুঁ'র পরপরই ডান হাতে কান বন্ধ করতে হলো। সূরা ইয়াসিন দীর্ঘ সময় কানের ভেতর থাকে।

হাজাম ধারালো বাঁশের কঞ্চি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়া মাত্র সে দলের পুরুষদের খতনা শুরু করল। তাদের চোখের জল এবং চাপা গোঙানির ভেতর দিয়ে ইসলামধর্মে দাখেলের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। অম্বিকা ভট্টাচার্যের নাম হলো— মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। সবাই ডাকা শুরু করল সিরাজ ঠাকুর। ঠাকুর থেকে মুসলমান হয়েছেন এই জন্যেই নামের শেষে ঠাকুর।

এই ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখ্যার একটা কারণ আছে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের মাতুল বংশের একটা শাখার পূর্বপুরুষ ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্য। বর্তমান পুরুষরা হিন্দুয়ানির সব ছেড়েছেন, ঠাকুর পদবি ছাড়েন নি। ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের এক নানার নাম আনিসুর রহমান ঠাকুর। তিনি কঠিন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তাঁর রাত কাটতো এবাদত বন্দেগি করে।

জুলেখার বাড়িতে আজ নতুন অতিথি। অতিথিকে জুলেখার চেনা চেনা লাগছে। ঠিক চিনতে পারছে না। তবে এই মানুষটাকে সে যে দেখেছে এই বিষয়ে সে নিশ্চিত।

অতিথি খাটে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছেন। এই খাট জুলেখা নতুন কিনেছে। ময়ূর খাট। ময়ূরের কাজ করা। অতিথি বলল, তোমার সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছি। তোমার নাম কী গো ?

জুলেখা বলল, পিতামাতা নাম রাখতে বিস্মরণ হয়েছেন। আপনে সুন্দর দেইখা নাম দেন।

অতিথি বলল, আমার সাথে 'মীমাংসায়' (ধাঁধায়) কথা বলবা না। আমি মীমাংসা পছন্দ করি না। তোমার নাম বলো, ধর্ম বলো।

জুলেখা বলল, আমার যেমন নাম নাই, ধর্মও নাই। আমার ঘরে যে আসে তার ধর্মই আমার ধর্ম।

নাম বলো। নাম না বললে উইঠ্যা চইলা যাব।

অতিথি উঠার ভঙ্গি করল। জুলেখা চুপ করে রইল। চলে যেতে চাইলে চলে যাবে। জুলেখা বাধা দিবে না। অতিথি বলল, তুমি সুন্দর ঠিক আছে, কিন্তু অতি বেয়াদব মেয়ে। সঙ্গে বন্দুক থাকলে গুলি করতাম। বেয়াদব মেয়ের একটাই শাস্তি— নাভি বরাবর গুলি।

জুলেখা এই কথায় অতিথিকে চিনল। ইনি এককালের জমিদার শশাংক পাল। হাতি নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতেন। বাঘের সন্ধান করতেন। জুলেখা বলল, আপনার মাথা সামান্য গরম হয়েছে। শরবত খাবেন ? শরবত খাইলে মাথা ঠাণ্ডা হবে।

তুমি তোমার নাম বলো। নাম বললে মাথা ঠাণ্ডা হবে।

আমার এক নাম জুলেখা। আরেক নাম চান বিবি।

কোনটা আসল ?

দুইটাই আসল।

মুসলমান ?

হঁ।

কালো ব্যাগটা খোল। বোতল আছে। গেলাসে কইরা বোতলের জিনিস দেও। আইজ এই জিনিস বেশি কইরা খাইতে হবে। মন অত্যধিক খারাপ।

মন খারাপ কী জন্যে ?

আইজ অধিকা ভট্টাচার্য দলেবলে মুসলমান হইছে, খবর পাও নাই ?

জুলেখা বলল, তার গরু খাওনের ইচ্ছা হইছে সে মুসলমান হইছে। আপনার কী ? আপনে ফুর্তি করতে আইছেন ফুর্তি করেন। গান শুনবেন ?

গান জানো ?

শিখতেছি।

শিখাশিখির গানের মধ্যে আমি নাই। সারাজীবন বড় বড় ওস্তাদের মাহফিলে গান শুনেছি। বড় বড় বাইজিদের নাচ গান শুনে সোনার মোহর দিয়েছি।

জুলেখা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, এখন তো আপনার হাতে সোনার মোহর নাই। আমার গান ছাড়া গতি কী ?

শশাংক পালের ভুরু কুঁচকে গেল। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। এই মেয়ে কথার পিঠে কথা বলার বিদ্যায় ওস্তাদ। এর সঙ্গে সাবধানে কথা বলতে হবে।

জুলেখা গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে নিচু গলায় গান ধরল—

ও পক্ষী আমার চক্ষু খাইও না।

সর্বাস্থ খাইও পক্ষী

চক্ষু খাইও না।

শশাংক পালের মুগ্ধতার সীমা রইল না। মেয়ের যেমন কণ্ঠ তেমন গান। সে এক জায়গায় বসে বসে গান করছে না। ঘুরাফেরা করতে করতে গাইছে। কখনো কাছে আসছে, কখনো দূরে যাচ্ছে। গান গাইতে গাইতে সুপারি কাটছে। ছড়তার শব্দটাও তখন তালে হচ্ছে। শশাংক পালের মনে হলো, আগেকার দিন থাকলে অবশ্যই এই মেয়ের দিকে একটা বা দু'টা স্বর্ণমুদ্রা ছুড়ে দেয়া যেত।

অ্যাই মেয়ে, তোমার নাম যেন কী ?

কমলা রানী।

একটু আগে বলেছ জুলেখা, এখন কমলা রানী বলতেছ কেন ?

নাম তো আপনার মনে আছে, আবার জিজ্ঞাস করলেন কেন ?

তামুক খাব। ব্যবস্থা কর। তামাক সঙ্গে আছে। হুঁকার নল ভালো করে ধুয়ে তারপর দিবা।

জুলেখা হাসল।

শশাংক পাল ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করল— আফসোস, সময়কালে তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

জুলেখা বলল, সময়কালে দেখা হইলে কী করতেন ?

শশাংক পাল জবাব দিলেন না। গ্লাস শূন্য। তিনি গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন। জুলেখা গ্লাস ভর্তি করতে করতে বলল, আমার জন্যে টাকা পয়সা কী এনেছেন ?

তুমি কত নাও ?

যে যা দেয় তাই নেই। আপনে জমিদার মানুষ, আপনে দিবেন আপনার সম্মান মতো।

আজ সেই রকম দিতে পারব না। কাল দিব।

আইজ কি খালি হাতে আসছেন ?

শশাংক জবাব দিলেন না। তিনি ঠিক খালি হাতে আসেন নি। রুপার একটা ফুলদানি নিয়ে এসেছেন। দামি জিনিস। এই মেয়ে কি তার কদর বুঝবে ?

আইজ খালি হাতে আসলেও ক্ষতি নাই। আইজ খালি হাতে আসছেন, কাইল ভরা হাতে আসবেন। জগতের এই নিয়ম। আইজ পূর্ণিমা কাইল অমাবস্যা। খানা খাবেন না ? খানা দেই।

খানা খাব ?

হাবিজাবি জিনিস বেশি খাইলে খানা খাইতে পারবেন না।

কী খাওয়াবে ?

আলোচালের ভাত। গাওয়া ঘি। বেগুন ভাজি আর মুগের ডাল। নিরামিষ খাওয়া। দিব ?

দাও।

আসেন হাত-মুখ ধুয়ায়ে দেই, তারপর খানা খান।

জুলেখা।

জি।

তুমি অতি ভালো মেয়ে।

আপনেও অতি ভালো মানুষ। আপনার হাত কাঁপতেছে কেন ?

আমার হাতকাঁপা রোগ হয়েছে।

চিকিৎসা কইরা হাত ঠিক করেন। হাতকাঁপা রোগ নিয়া গুল্লি করবেন ক্যামনে ?

জুলেখা খিলখিল করে হাসছে। মুগ্ধ চোখে শশাংক পাল তাকিয়ে আছেন।

জুলেখা!

জি।

তুমি কি আমাকে বিবাহ করবে ? এখন আমার কিছুই নাই, তারপরেও মরাহাতি লাখ টাকা বইলা কথা। তোমারে আমি আদর সোহাগে রাখব।

রাখবেন কই ?

কলিকাতা নিয়া চইল্যা যাব । মালিটোলায় আমার ঘর আছে । দোতলা ঘর ।
জুলেখা বলল, যাব । কইলকাতা শহর দেখা হয় নাই । দেখার শখ আছে ।
তোমারে সবকিছু দেখাব । বজরা ভাড়া করব । কালিঘাট থাইকা বজরা
ছাড়ব । সমুদ্র বরাবর বজরা যাবে । তুমি আমি ছাদে বইসা থাকব । তুমি গান
করবা, আমি গুনব ।

জুলেখা বলল, বাহ !

শশাংক পাল বললেন, যৌবনে আমি অনেক গান লিখেছি । ট্রাংকভর্তি ছিল
লেখা । গানগুলো থাকলে সুবিধা হইত । তুমি গাইতে পারতা ।

কোনোটা মনে নাই ?

উঁহ । মনে করার চেষ্টা নিতেছি । মনে পড়লেই তোমারে বলব । বৃদ্ধ বয়সের
এক সমস্যা— কিছু মনে থাকে না ।

শশাংক পালকে জুলেখা যত্ন করে খাওয়ালো । নিরামিষ শশাংক পাল খেতে
পারেন না । আজ তৃপ্তি করেই খেলেন । খাওয়ার শেষে হাতে পান দিতে দিতে
জুলেখা বলল, এখন বাড়ি যান ।

শশাংক পাল বিস্মিত হয়ে বললেন, বাড়ি যাব কেন ? তোমার এখানে
নিরামিষ খাওয়ার জন্যে আসি নাই । রাত্রি যাপন করতে আসছি ।

জুলেখা বলল, আরেকদিন আসবেন । টাকা-পয়সা নিয়া আসবেন । রঙিলা
বাড়ির মালেকাইন সরজুবালা, উনার কঠিন নিয়ম । উনি বলেছেন— তেল মাখার
আগে কড়ি ফেলতে হবে ।

তুমি তাকে আমার নাম বলো । নাম বললেই মন্ত্রের মতো কাজ হবে । তাকে
বলো জমিদার শশাংক পাল এসেছেন । এটা তার বাড়ির জন্য একটা ইজ্জত ।

সরজুবালা ঘুমায়ে পড়েছেন । একবার ঘুমায়া পড়লে তারে জাগানো যাবে
না ।

তোমার জন্যে আমি রুপার ফুলদানি এনেছি ।

শশাংক পাল ব্যাগ খুলে ফুলদানি বের করলেন । জুলেখা হাই তুলতে
তুলতে বলল, ফুলদানি এনেছেন ভালো করেছেন । পরেরবারে যখন আসবেন
দেখবেন ফুলদানি ভর্তি ফুল । এখন বাড়িতে যান ।

বাইরে বৃষ্টি পড়তেছে । বৃষ্টির মধ্যে আমি কই যাব ?

ছাতা দিতেছি । ছাতা মাথায় দিয়া চইলা যাবেন ।

জুলেখা শোন । আমি রাতে যাব না । চারদিকে আমার শত্রু । রাতে বিরাতে আমার চলাচল নিষেধ ।

জুলেখা হাসিমুখে বলল, ধানাই পানাই কইরা লাভ নাই । আপনার যাইতে হবে । বৃষ্টির মধ্যেই যাইতে হবে । আগে আপনাকে বলেছিলাম ছাতা দিব । ভুল বলেছিলাম । ছাতা দিতে পারব না । ঘরে ছাতা নাই । আপনি যাবেন ভিজতে ভিজতে ।

হরিচরণ টিনের চালাঘরে খাটের উপর বসেছিলেন । বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে । টিনের চালায় বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভালো লাগছে । রাত অনেক হয়েছে । ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তিনি ঘুমুতে যাচ্ছেন না । চোখে প্রবল ঘুম নিয়ে জেগে থাকার আনন্দ আছে । তাঁর কোলের উপর লালসালু কাপড়ে বাঁধানো খাতা এবং ঝর্ণা কলম । সন্ধ্যায় খাতায় অনেক কিছু লিখেছেন । আরো লেখার ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু আলসি লাগছে । বৃষ্টির শব্দ মানুষকে অলস করে দেয় । হরিচরণ খাতার পাতা উল্টালেন—

অদ্য ঠাকুর অম্বিকা ভট্টাচার্যের ধর্মাস্তরের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম । তাঁহাকে ভুলুপ্তিত বিষাদ বৃক্ষের মতো মনে হইল । তাহার দীর্ঘ দেহ ছটফট করিতেছিল । এক পর্যায়ে তিনি ‘জল জল’ বলিয়া চিৎকার করিলেন, তখন আসরে উপস্থিত ধনু শেখ বলিল, জল কবেন না । এখন থাইকা পানি কবেন । অম্বিকা ভট্টাচার্য বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, পানি । পানি ।

হরিচরণকে লেখা বন্ধ করতে হলো । টিনের দরজা নাড়ার শব্দ হচ্ছে । রাত অনেক হয়েছে । বাইরে দুর্যোগ । এই দুর্যোগে কে আসবে তার কাছে!

হরি, দরজা খোল । আমি শশাংক ।

হরিচরণ দরজা খুলে বিস্মিত হলেন । শশাংক পাল কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন । চোখ রক্তবর্ণ । শীতে থরথর করে কাঁপছেন ।

হরি, বিশটা কাঁচা রুপার টাকা দিতে পার ? বায়না হিসেবে দাও ।

কিসের বায়না ?

কলিকাতা শহরে আমার একটা দোতলা বাড়ি আছে । ঐ বাড়ি আমি লেখাপড়া করে তোমাকে দিয়ে দিব । ভগবান সাক্ষী, কথার অন্যথা হবে না ।

হরিচরণ বললেন, আপনি ঘরে এসে বসুন । আপনাকে গুকনা কাপড় দেই । তোয়ালে দেই । মাথা মুছেন । আগুন করে দেই, আগুনের পাশে বসেন ।

আমার এখনই যেতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন। তুমি বিশটা টাকা দাও।
দিতে পারবা? ঘরে টাকা আছে?

আছে।

তাহলে আরেকটা কাজ করো। তোমার হাতিটা আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে
ধার দাও। আমি হাতির পিঠে করে এক জায়গায় যাব।

কোথায় যাবেন?

কোথায় যাব তোমার জানার প্রয়োজন নেই। অনেক দিন হাতির পিঠে চড়ি
না। হাতির পিঠে চড়তে ইচ্ছা করছে।

হরিচরণ বললেন, আপনার শরীর ভালো না। দেখে মনে হয় জ্বর এসেছে।
রাতটা আমার এখানে থাকেন। হাতিতে চড়ে সকালে যেখানে যাবার সেখানে
যাবেন।

হরিচরণ! আমার এখনই যেতে হবে। আমি যেখানে যাব সেখানে দিনের
আলোয় কেউ যায় না। ঠিক আছে, তোমারে খোলসা করে বলি। আমি যাব
রঙিলা বাড়িতে। এখন বুঝেছ?

হরিচরণ কিছু বললেন না। শশাংক পাল গলা নামিয়ে বললেন, মৃত্যুর পরে
কিছু নেই। শরীর পুড়িয়ে ফেলবে। ছাই পড়ে থাকবে। ছাইয়ের ভোগের ক্ষমতা
নেই। আনন্দ পাওয়ার ক্ষমতা নেই। দেহধারীর আছে। এখন বুঝেছ? টাকা
বের করো।

হরিচরণ টাকা বের করলেন।

কাগজে লেখো— কলিকাতা ১৮ ধর্মচরণ সড়কের বাড়ি মজু ভিলার ক্রয়ের
বায়না বাবদ বিশ টাকা। আমি টিপসই দিতেছি।

টিপসই দিতে হবে না, আপনি টাকা নিয়ে যান।

হাতি বের করতে বলো। হাতির পিঠে হাওদা দিতে বলো।

গভীর রাতে হাতির পিঠে চড়ে শশাংক পাল রওনা হলেন। হাতির গলায় রুপার
ঘণ্টা বাজতে লাগল— টুন টুন টুন।

পথ কর্দমাক্ত। হাতির চলতে অসুবিধা হচ্ছে। কাদায় পা ডেবে যাচ্ছে। তবে
হাতি আপত্তি করছে না। বাজার পার হয়ে উত্তরের সরু পথের কাছে হাতি
থমকে দাঁড়াল। গুঁড় দোলাতে লাগল। সে আগাবে কি আগাবে না এই সিদ্ধান্ত
নিচ্ছে।

ধনু শেখ এই সময় বাজারের দোকান বন্ধ করে ফিরছে। তার মাথায় একজন ছাতি ধরে আছে। পেছনে আরেকজন, তার হাতে বাঁশের পাকা লাঠি। হাতি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার বিশ্বয়ের সীমা রইল না। হাতির পিঠে বসে থাকা মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না। ধনু শেখের হাতে হারিকেন। সে হারিকেন উঁচু করে ধরে বলল, কে? হাতির পিঠে কে?

শশাংক পাল বললেন, নিজের পরিচয় আগে দাও। তুমি কে?

ধনু শেখ বলল, গোস্তুকি মারফ হয়। আপনাকে চিনতে পারি নাই। সালাম। হুজুর কই যান?

শশাংক পাল বললেন, বিষ্টি বাদলার দিনে আলাপ পরিচয় করতে ভালো লাগতেছে না। তুমি ধনু শেখ না?

জে।

খাসির মাংস বইলা তুমিই তো অধিকা ভট্টাচার্যকে গরু দিলা?

ভুলক্রমে দিয়েছি। আমি বিরাট অপরাধ করেছি।

ভুলক্রমে কর নাই। কাজটা তুমি করেছ সজ্ঞানে। আগের ক্ষমতা যদি থাকতো তোমারে আমি নেংটা কইরা গ্রাম চক্কর দেওয়াইতাম।

ধনু শেখ বলল, দশজন বললে এখনো আমি নেংটা হইয়া গ্রাম চক্কর দিতে পারি। কোনো অসুবিধা নাই।

তুমি অতি ধুরন্ধর।

কথা সত্য।

আমার একটা দোনলা বন্দুক আছে, খরিদ করতে চাও?

অবশ্যই চাই।

দোনলাটা নেত্রকোনা সদরে বন্ধক দেয়া আছে। বন্ধকি ছুটায়ে বিক্রি করতে রাজি আছি। আমার অর্থের প্রয়োজন।

ধনু শেখ বললেন, আমি আগামীকাল নিজে উপস্থিত হব।

হাতি নড়তে শুরু করেছে, সম্ভবত তার বিবেচনায় এখন যাওয়া যায়। বৃষ্টি কমে এসেছে। চারপাশে ঘন অন্ধকার। দূরে রঙিলা বাড়িতে আলো দেখা যায়।

ধনু শেখ দোটানায় পড়েছে। রঙিলা বাড়ির দিকে যাবে, না নিজ বাড়িতে যাবে? আজ মঙ্গলবার না, তারপরেও ঝড়বৃষ্টির রাতে গানবাজনা, আমোদ ফুটি ভালো লাগে। আজ সারাদিন নানান ঝামেলা গিয়েছে। ঝামেলার শেষ করতে হয় আমোদ দিয়ে। এইটাই নিয়ম।

ধনু শেখ নিয়মের ব্যতিক্রম করে বাড়ির দিকে রওনা হলো। বাড়িতেও আনন্দের ব্যবস্থা আছে। তারা নামের যে ঘাটুছেলেকে দুই মাসের চুক্তিতে রাখা হয়েছে সেই ছেলেটা ভালো। তার গানের গলাও ভালো। দুই মাসের চুক্তি শেষ হওয়ার পথে। ছেলের বাবা এসেছিল ছেলেকে নিয়ে যেতে। অনেক দেনদরবার করে তাকে ফেরানো হয়েছে। লোকটা বদের হাড়ি। নতুন চুক্তিতে যাবে না। সে না-কি জমি কিনেছে। খেতের কাজে ছেলেকে দরকার। চাপ দিয়ে চুক্তির টাকার পরিমান বাড়াতে চায় এটা পরিষ্কার। ধনু শেখ চাপ খাওয়ার বস্তু না।

বাড়িতে পৌঁছে ধনু শেখ গরম পানিতে গোসল করল। খাওয়া দাওয়া সেরে পালঙ্কে গা ছেড়ে দিল। ধনু শেখের স্ত্রী কমলা পানের বাটা নিয়ে এলো। পান মুখে দিতে দিতে ধনু শেখ জড়ানো গলায় বলল, তারাকে ডাক। গানবাজনা হোক।

কমলা বলল, সে তো নাই।

হতভম্ব ধনু শেখ বলল, নাই মানে কী ?

চইলা গেছে।

কই চইলা গেছে ?

তার দেশের বাড়িতে।

কখন গেছে ?

সইন্ক্যা কালে।

ধনু শেখ কঠিন গলায় বলল, মাগি তুই নিজেই কী ভাবস ? সইন্ক্যা কালে গেছে, তুই আমারে খবর দিবি না ? আমার বন্দুক নাই। বন্দুক থাকলে আইজ তরে গুলি কইরা মারতাম।

ধনু শেখ পালঙ্ক থেকে নামছে। চাদর গায়ে দিচ্ছে। কমলা ভীত গলায় বলল, আপনে যান কই ?

ঐ বলদ পুলারে আনতে যাই। আইজ রাইতের মধ্যে যদি তারে না আনছি, ঘুংঘুর পরাইয়া না নাচাইছি তাইলে আমার নাম ধনু শেখ না। আমার নাম কুত্তা শেখ।

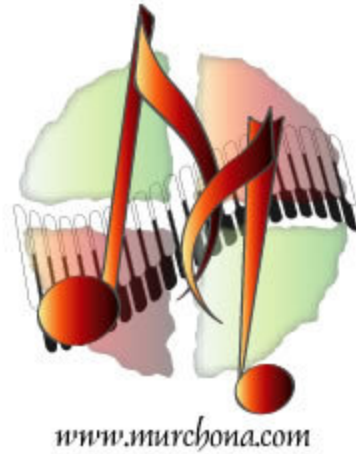
কমলা ক্ষীণস্বরে বলল, সকালে যান।

ধনু শেখ বলল, মাগি চুপ! আমি এখনই যাব। ঐ পুলারে আইন্যা মাওলানা ডাকায়া শাদি করব। সে-ই হইব তোরা আসল সতিন।

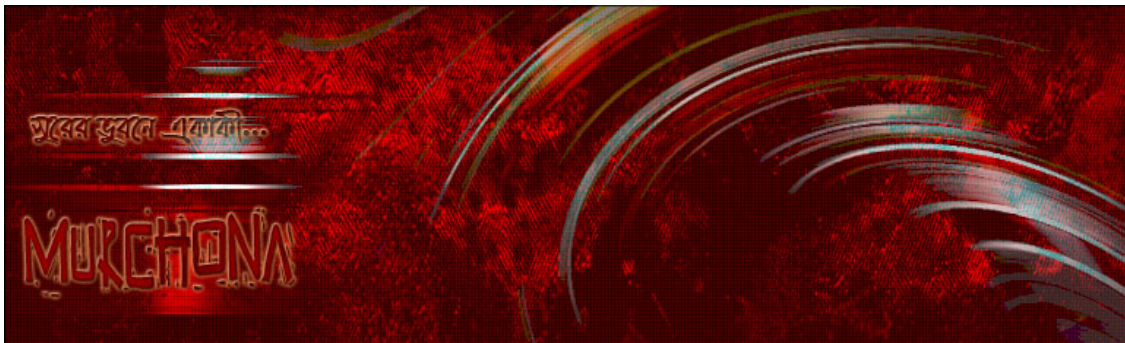
পুরুষের সাথে পুরুষের বিবাহ হয় ?

টাকা থাকলে সবই হয় ।

ধনু শেখ দুর্যোগের রাতেই বের হয়ে গেল । পথে কালী মন্দির পড়ল ।
বাজারের কালী মন্দির । ধনু শেখ কালীমূর্তির মাথা ভেঙে ফেলল । গুরুত্বপূর্ণ
কাজে যাওয়ার সময় কোনো মুসলমান যদি হিন্দু মন্দিরের কোনো ক্ষতি করে
তাহলে বিনা ঝামেলায় কার্য সমাধা হয় । এই ছিল তখনকার লোকজ বিশ্বাস ।



Maddhanya by Humayun Ahmed Part-1



For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com